৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

মেলামেলা

প্রকৃতিই আপনার ত্বকের শত্রু!

ত্বকের সুরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক উপাদান ও প্রকৃতিদত্ত উপায়ই সবচেয়ে ভাল...

বোরোক্যালেনডুলা-ই একমাত্র অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম যাতে আছে প্রাকৃতিক উপাদান—ক্যালেনডুলা ও হাইড্রাসটিস ভেষজের নির্য্যাস। যা সব সময় আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

বোরো ক্যালেনড়ুলা অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম মাখুন, আপনার ত্বক স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখুন।

বোরো ক্যালেনড়ুলা*

অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম

* A PATENT & PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE, OF HAHNEMANN LABORATORY, CALCUTTA - 12

anjan chakraborty, Cal-74

২৩ মাঘ ১৩৯১ □ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ □ ১০ বর্ষ ১৬ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস
একদিন এক গোলাপবাগানে । বিমল কর ৩৭
বড়গল্প
প্রবলেম সলভার পুল্লা রেড্ডি । মীরা বালসুব্রমনিয়ন ১৩
গল্প
টমসাহেব । তারাপদ রায় ১১
বুদ্ধির পরীক্ষা । জীবরাম যোশি ৫০
বিজ্ঞানবিচিত্রা
এলাম আমি কোথা থেকে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৭
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৭
ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২২
গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২৫
বিশেষ রচনা
পদ্ম । ভিক্ষু বুদ্ধদেব ৯
কবিতা ও ছড়া
ঘুঘুটি ঘুঘুটি··· । দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫
তলব । জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ৩১
শার্লক হোম্‌সের গল্প
ওষ্ঠবক্র রহস্য । সার আর্থার কোনান ডয়েল ২৭
লেখাপড়া
সহজে ইংরেজি (রাস্তা দিয়ে মিছিল) । প্রসাদ ৬
অর্থ জানো (গণ্ডগ্রাম···চতুরঙ্গ) । দেব-সেনাপতি ৬
বারাকপুর গার্লস হাইস্কুল··· । শ্যামলকান্তি দাশ ৬২
খেলাধুলো
মাদ্রাজ টেস্টে পরাজয় । অশোক রায় ৫২
ছয়ের ছড়াছড়ি । মণীশ মৌলিক ৫৩
সেঞ্চুরি দিয়ে অভিষেক । নৃপতি চৌধুরী ৫৪
লয়েড ক্রিকেট ছাড়লেন । সম্রাট রায় ৫৫
টেস্ট খেলার পত্তন । সুব্রত সিংহ ৫৭
চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ৩৪, সদাশিব ৪৯
টারজান ৬১, গাবলু ৬৫
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮, মজার খেলা ৫৯
হাসিখুশি ৫৯, তোমাদের পাতা ৬৬

প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক। যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ– অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক। ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

জনসন্স বেবী লোশন
কেননা নরম ত্বক
আপনার বয়সকে গোপন করে রাখে

জনসন্স বেবী লোশন
একটি কোমল, গোলাপী লোশন...
ত্বককে কোমল রাখার ইমোলিয়েন্ট-এর
মিশ্রণ যা আপনার ত্বকের নিজস্ব আর্দ্রতা
বজায় রাখার তরল পদার্থের মতই
কাজ করে।

তরুণ ত্বকে এই তরল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকায় এটি আপনার স্বাভাবিক কোমলতা ও নমনীয়তা বজায় রাখে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ত্বককে কোমল রাখার প্রাকৃতিক ইমোলিয়েন্ট শুকিয়ে যেতে শুরু করে।

আপনার ত্বক তেলতেলে হলেও এমনটি হতে পারে। কেননা আপনার ত্বকের কোমলতা নির্ভর করে শুধুই তার আর্দ্রতার ওপর। তেলতেলে শুকনো হওয়ার উপর নয়।

আপনার ত্বক যে রকমই হোক না কেন, জনসন্স বেবী লোশন আপনার ত্বকের নিজস্ব স্বাভাবিক তরল পদার্থের সাথে একযোগে কাজ করে। তাতে আনে প্রাণের জোয়ার ও আপনার রঙরূপে পুষ্টি যোগায়।

একটুখানি জনসন্স বেবী লোশনে কাজ পাওয়া যায় অনেক। এটি তেলতেলে নয় এবং এটি আপনার ত্বকে এত দ্রুত শুষে যায় যে এর কাজ শুরু হওয়া আপনি অনুভব করবেন। এটি আপনার ত্বককে কোমল রাখবে।

বয়সের চেয়ে আপনাকে ছোট দেখাবে।

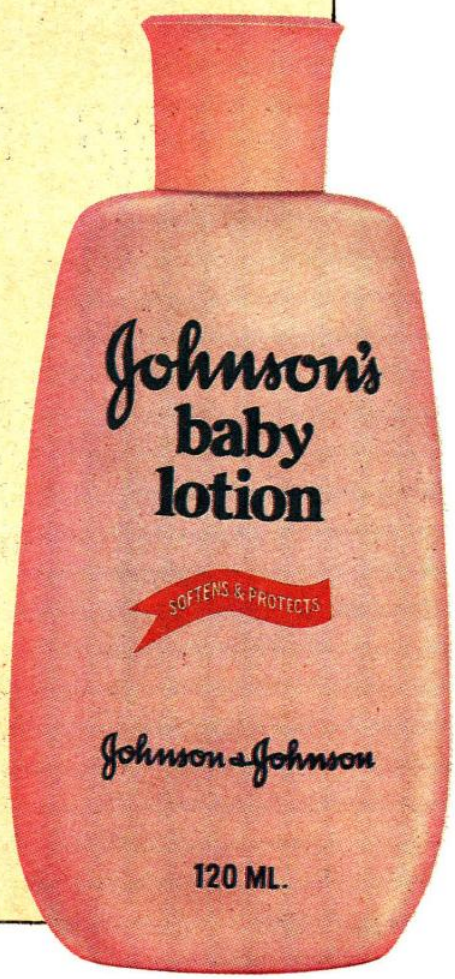

জনসন্স বেবী লোশন। আপনার ত্বক কিছুতেই আপনার বয়স প্রকাশ করতে পারবে না।

OBM/4151 BEN

ঘুঘুটি ঘুঘুটি রাত ঘুরঘুটি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুঘুটি ঘুঘুটি রাত ঘুরঘুটি—
টেরিটিবাজারে হারাল দু ঘুঁটি।
জ্যাবড়া আলোয় পথ করে ভোঁ ভোঁ,
দুটো খেলে পরে তখ্খুনি শোবো।
ধর্মতলায় ট্রাম ঝম্‌ঝম্—
ঘুগনি-কচুরি গরমাগরম।
লাল আলো পড়ে মাথা ঘোরে গলি,
আরটুকু যাই—আর দু পা চলি—
বেলেঘাটা পোলে হাই তোলে রাত,
জল বেজে চলে ছলাত ছলাত···

ঘুঘুটি ঘুঘুটি তারা ভুরকুটি—
ঝুপড়ির চালে ফুলের মুখুটি।
বাতি টিম্‌টিম্, রেলের লাইন,
বিজ্‌রিলতায় হাওয়া ঝিন্‌ঝিন্—
দাঁত কষকষ—চোখ টানটান—
ভাবি শুয়ে যাই অমনি সটান।
দুটো ভ্যাবা লোক বসে একঠেয়ে।
আঘুমো কুকুর জুলজুল চেয়ে।
ডাক পেড়ে ওঠে রাতকানা ঘড়ি—
ক্যাঁথাটি পাই তো ঝাঁপ দিয়ে পড়ি···

ঘুঘুটি ঘুঘুটি রাত ঘুরঘুটি—
দু পা হেঁটে যাই, দু কদম ছুটি—
দম চাপা খানা, পথ শির-শির,
আঁচির পাঁচির আঁচির পাঁচির—
ভুত্-ভুত্-ভুত্—পাখি ঝটাপটি,
এক পোয়া পথ মশার ঝাপটি,
এক পোয়া পথ অশথের জট,
পাকুড়ের পাত, হাঁটু ছট্‌ফট্,
ভুষো মুখ খুলে বৌ-দেয়া গাছ—
পর পর বুক-চম্‌কা আওয়াজ···

ঘুঘুটি ঘুঘুটি ও মা সেই ঘুঁটি!
বাজি পুড়ে ওঠে দীপক নিদুটি।
সোনা মুখ দেখে চাই আনমনা,
হাউইয়ের পিঠে জুঁইয়ের বাজনা।
ঝুম্‌ঝুম্ বাজে, ঘুমঘুম বাজে,
এক গোটা ফুল তুলে রাখি কাছে।
এক গোটা ফুল পরে রাখি হাতে।
ভেসে উড়ে চলি উড়ন ঘোড়াতে—
ঘুমে বাজে তার গলার ঘুণ্টি—
ঘুঘুটি ঘুঘুটি রাত ঘুরঘুটি···

ছবি : দেবাশিস দেব

অর্থ জানো

গণ্ডগ্রাম…চতুরঙ্গ…

অনেক শব্দ সম্বন্ধেই আমাদের পরিচয় যা থাকে, তা ভাসা ভাসা । কিন্তু উটকো লোকের সঙ্গে যে পরিচয়, শব্দের সঙ্গে সে-ধরনের পরিচয় হলে চলে না । শব্দ হবে আমাদের অতি পরিচিত, অন্তরঙ্গ । কারণ, মনের যা-কিছু ভাব, তা শব্দের মধ্য দিয়েই আমরা যথার্থ প্রকাশ করতে পারি । নীচের প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে । যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে । সবশেষে উত্তর মেলাবে ।

১ । **হরিৎ**—(ক) হলুদ বর্ণ, (খ) ঈষৎ নীল, (গ) সবুজ, (ঘ) ধূসর রং ।

২ । **অনুদান**—(ক) অণুমাত্র অর্থাৎ অল্প পরিমাণে দান, (খ) উদার হস্তে দান, (গ) পর্যাপ্ত দান, (ঘ) কর্তৃপক্ষীয় অর্থসাহায্য ।

৩ । **গণ্ডগ্রাম**—(ক) অজ পাড়া-গাঁ (খ) বড় গ্রাম, (গ) গণ্ড নামে যে গ্রাম, (ঘ) কোলাহল-মুখরিত গ্রাম ।

৪ । **চতুরঙ্গ সেনা**—(ক) চতুর সেনাবাহিনী, (খ) যে সৈন্যদল চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে, (গ) বাম দক্ষিণ সম্মুখ ও পশ্চাতে অবস্থিত সেনাবাহিনী, (ঘ) হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিক, এই চার শাখাবিশিষ্ট সৈন্যদল ।

উত্তর—১ । সবুজ । যেমন—'কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে' (দ্বিজেন্দ্রলাল) ।

২ । (ঘ) কর্তৃপক্ষের অর্থসাহায্য । যেমন—গ্রামের বিদ্যালয়টি সম্প্রতি অনুদান পেয়েছে ।

৩ । (খ) বড় গ্রাম । গণ্ডারের মতো বৃহৎ অর্থে । আমরা সাধারণত শব্দটিকে ছোট গ্রাম বলে ভুল করি ।

৪ । হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি এই চার শাখাবিশিষ্ট সৈন্যদল । চতুঃ শব্দের অর্থ চার । তার সঙ্গে অঙ্গ শব্দ যুক্ত হয়ে চতুরঙ্গ শব্দটি গঠিত হয়েছে । যেমন—'চতুরঙ্গে রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা' (কবি মধুসূদন) ।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

রাস্তা দিয়ে মিছিল

রাস্তা দিয়ে একটা মিছিল যাচ্ছিল । মিলি আর মা দোতলার বারান্দা থেকে দেখছিলেন । মিলি একটু বেশি ঝুঁকে ছিল, রেলিঙের ওপর দিয়ে ।

Mother said, "Don't lean out too far, Milly. You don't want an accident to happen, do you?"

"Oh, I won't fall down, Mummy." Milly said, "I'm not a baby."

"I know you aren't.. But you can't tell about accidents. Even grown-ups have been known to have them. There's no harm in being careful."

কিন্তু মিলির কান ছিল মিছিলের দিকে ।

Milly had never seen an accident happen. Not a serious accident, anyway. So she really couldn't believe that such a thing could happen to her. All her attention was to the procession. It was a fairly long one, with a sprinkling of women in it. Milly was trying to catch the slogans they were raising.

They were asking for votes. Milly also heard them telling people to put up a fight against this or that evil. She couldn't quite make out what those evils were. But she seemed to hear them talk about conspiracies. It seemed that there were people trying to do great harm to the country.

"Who can they be?" she wondered.

ততক্ষণে চম্বলও এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে ।

"Are you going to vote, Mother?" he asked.

"Of course I am, and I hope you will, too, when you are old enough. Didn't you hear your father say every one should vote?"

Milly's eyes were on the procession. She watched it disappear round the corner. Then she turned to her mother.

"Who are you going to vote for, Mummy?" she asked. "Are you going to vote for their man?"

"I'll make up my mind about that," Mother said.

Milly said, "I'll ask Daddy who *he* is going to vote for."

"What's that to you?" Chambal said. "You're not going to vote for years and years."

"Neither are you," Milly replied.

এবারে এই ক্রিয়াপদগুলো লক্ষ করো :

see, hear, watch

Milly had never seen an accident happen.
She seemed to hear them talk about conspiracies.
Didn't you hear your father say every one should vote?
She watched it disappear round the corner.

প্রসাদ

যাকে দেখতে নারি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সব-কিছুরই ক্ষয় হয়। আমার খদ্দরের ফতুয়াটা জ্যালজেলে হতে হতে ফর্দাফাঁই হয়ে গেল।

আমাদের শরীর ? গায়ের চামড়া, জিভ, পেট, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ? হ্যাঁ, সে-সবেরও ক্ষয় আছে।

কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে এসবও কেন খয়ে-খয়ে পাতলা ফিনফিনে হয়ে যায় না ? সবই তো দেখছি যে-কে সেই রয়ে যাচ্ছে। তার কারণ কী ?

কোটি কোটি সূক্ষ্ম কোষ দিয়ে আমাদের শরীর তৈরি। সুতোর মতোই সমানে এইসব কোষের ক্ষয় হচ্ছে। কিন্তু সুতোর সঙ্গে শরীরের কোষের একটা তফাত আছে। পুরনো কোষগুলো মরবার সঙ্গে-সঙ্গে সে-জায়গায় জন্ম নেয় নতুন-নতুন কোষ। এইভাবে আমাদের শরীরে প্রতি সেকেণ্ডে এক কোটি লাল কোষ মরে গিয়ে নতুন এক কোটি লাল কোষ জন্মাচ্ছে।

এসব কোষ এত ছোট যে, খালি চোখে দেখা যায় না। দেখতে হলে চাই জোরালো অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

খুদে বলতে কত খুদে ? একটা নমুনা দিলেই তা বোঝা যাবে।

একটা ছুঁচের মুখ দিয়ে এই রকমের প্রায় বিশ লক্ষ কোষ একসঙ্গে একবারে গলে যেতে পারে।

কোষগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হল ডিম্বকোষ। বড় বলতে কত বড় ?

এক ইঞ্চি ব্যাসকে ছ' হাজার ভাগ করলে তার এক ভাগ যতটা হয়, একটি ডিম্বকোষ তত বড়।

কিছু কিছু বদল ঘটে একেবারেই চর্মচক্ষের বাইরে। কোনো অণুবীক্ষণ যন্ত্রেই তা ধরা পড়ে না। পরিবর্তন যে ঘটেছে, সেটা বোঝা যায় শুধু পরিণতি দেখে। সকালে ঘরের ভেতর ধপ করে কাগজ এসে পড়ল। তা থেকে বুঝতে পারি, হকার কাগজ ছুঁড়ে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরাও সেইভাবে বুঝে নেন। তাঁরা জানেন, যে-সব রাসায়নিক দিয়ে আমাদের দেহকোষ তৈরি, মুহুর্মুহু তাদের বদল হচ্ছে। আমাদের শরীরের জৈব উপাদানগুলো বারবার যেমন নিজেদের বহুগুণিত করছে, তেমনি ক্ষয় আর মৃত্যুর ভেতর দিয়ে নিয়ত নিজেদের নতুন করে গড়ছে।

এই পরিবর্তনের ধারাকে বলে 'মেটাবলিজম' বা বিপাক-ক্রিয়া। (ক্রমশ)

জেনে নাও

জল আগুন নেবায় কেন

যদি কোথাও আগুন লাগে, তাহলে দেখি দমকল ছুটে আসে। তারপর জল ঢেলে সে আগুন নিবিয়ে ফেলে। জলে আগুন নেবে কেন ?

আগুনে জল ঢাললেই সেই জল জ্বলন্ত বস্তুর কাছে এসে উত্তাপে বাষ্প হয়ে যায়। এই বাষ্প জলের আয়তন থেকে শত শত গুণ বেশি আয়তন দখল করে। ফলে মুক্ত বায়ুকে জ্বলন্ত বস্তুর কাছে আসতে বাধা দেয়। কিন্তু এই মুক্ত বায়ুর অক্সিজেনই তো জ্বলনের কারণ আর অক্সিজেন ছাড়া জ্বলন সম্ভব নয়।

তা ছাড়া আগুন নেবাবার সময়ে জল যখন বাষ্প হয়, তখন অনেকটা তাপের দরকার। সে তাপটা সে নেয় জ্বলন্ত বস্তু থেকে। জ্বলন্ত বস্তু থেকে তাপ যাচ্ছে। সেই জন্যে জ্বলন্ত বস্তুর আর ততটা তপ্ত থাকার কথা নয়। তার উষ্ণতা নেমে আসবে। সব মিলিয়ে জল আগুন নেবায়।

সোনায় কেন মরচে ধরে না

সোনার পাথরবাটি কি সম্ভব ? পাথরবাটি যেমন সোনার হতে পারে না, তেমনি সোনায় মরচে ধরা অসম্ভব একটা ব্যাপার।

মরচে কী, মরচে বলতে আমরা যা বুঝি তা হল লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের একটা বিক্রিয়া। এই অক্সিজেন বাতাসেই পাওয়া যাচ্ছে। ফলে খোলা বাতাসে লোহা ফেলে রাখলেই লোহার এক রকমের অক্সাইড তৈরি হয়, যাকে আমরা বলি মরচে। এই অক্সাইডটি জলযুক্ত বা সোদক। এটা দেখা যায় কেবল লোহার পৃষ্ঠদেশে।

এখন লোহা একটা ধাতু। লোহার মতো সোনা আর একটা ধাতু। ফলে সোনার যদি কোনো অক্সাইড হয়, তা তো আর লোহার অক্সাইড হতে পারে না। কিন্তু খোলা বাতাসে লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় যেমন লোহার অক্সাইড হয়, সোনার বেলায় সে রকম কোনো বিক্রিয়া হয় না। এক তাল সোনা পড়ে থাক—বাতাসের অক্সিজেন তার কিচ্ছু করতে পারে না।

তা ছাড়া বাতাসে তো শুধু অক্সিজেন নেই। আরও কত রাসায়নিক পদার্থ আছে আমাদের আবহমণ্ডলে। রসায়নাগারের নানা উপায় ছাড়া খোলা বাতাসে কোনো রাসায়নিক পদার্থেরই সোনার সঙ্গে কোনো বিক্রিয়া হয় না, অক্সিজেনের সঙ্গে তো দূরের কথা ! ফলে, সোনা থেকে যায় সোনাই, তাতে কখনও মরচে ধরে না।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট করেছে আয়োজন, শীতে উষ্ণ-মধুরতায় ভরাবে সবার শরীর-মন

চকোলেট সিজ্‌ল !

এক কাপ ফুটন্ত গরম দুধে তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট মেশান আর সবাইকে খাওয়ান—ধোঁয়া ওঠা চকোলেট সিজ্‌ল কনকনে শীতে, শরীরকে চাঙ্গা রাখার এক মধুর উপায় !

চকোলেট সুঅর্ল !

বেশ খানিকটা গরম দুধে তিন চা-চামচা ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট মিশিয়ে দিন—ওপর থেকে দিন মধু ছড়িয়ে ! এ এক মধুর চকোলেট সুঅর্ল শীতের দিনের সাদর-আহ্বান, ভরিয়ে তোলে উষ্ণতায় দেহ-মন-প্রাণ।

চকোলেট নাটি !

গরম ধোঁয়া ওঠা এক কাপ দুধে তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট মিশিয়ে দিন। কুচো-বাদাম ছড়িয়ে দিন ওপরে ! চমৎকার চকোলেট নাটি !! উষ্ণ-মধুর চকোলেট মজাদার—ঘরের পানে টানে বারবার !

চকোলেট স্পাইস !

একমগ গরম দুধে তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট দিন মিশিয়ে ! দারুচিনি, জায়ফল ও এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে নেড়ে দিন—এ এক তাক্ লাগানো চকোলেট স্পাইস ! শীতের দিনে দেহ-মনে এনে দেয় উষ্ণতার অনুরণন !

ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট ২০০ গ্রামের টিনেও পাওয়া যায়!

OBM/3323 BEN

পদ্ম

ভিক্ষু বুদ্ধদেব

আমাদের জাতীয় পুষ্পের নাম জিজ্ঞেস করলে তোমরা সমস্বরে বলে উঠবে : পদ্ম। উত্তর দিয়ে মনে মনে এটাও ভাববে, এটা কি একটা প্রশ্ন হল ? কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয়, "পদ্মকে কাছ থেকে দেখেছ ?"

এর উত্তরে নিশ্চয়ই বলবে, "তা দেখিনি, তবে অনেক পুজোতেই তো পদ্মের ব্যবহার দেখেছি।"

তবে পদ্মফুলকে গাছেই যদি ফুটে থাকতে না দেখে থাকো তাহলে পদ্মকে মোটেই দেখা হয়নি। জোর করে খোলানো পদ্ম আর গাছে-ফুটে-থাকা পদ্মের ভেতরে তফাত অনেক।

বাগানে পদ্মের চাষ মোটেই কঠিন নয়, তবে পদ্ম তো পঙ্কজ, তাই এর জন্য পাঁকমাটি ও তার ওপরে জল লাগবে। পাঁকমাটি আধ মিটারের মতো পুরু হলেই চলবে, পাঁকমাটি না পেলে দু-ভাগ সাধারণ মাটি ও একভাগ গোবর মিশিয়ে নিলেও কাজ চলে যাবে। এর পরের বছর থেকে পদ্মপাতা পচে পাঁকমাটি তৈরি হয়ে যাবে। এই পাঁকমাটি বা সারমাটির উপরে জল থাকা দরকার আধ থেকে এক মিটার। গোড়ার মাটিতে যথেষ্ট সার ও যথেষ্ট জল থাকলে একই প্রজাতির পদ্মকে আরও বড় ফুল দিতে দেখা যায়। পদ্মের গেঁড় যোগাড় করে জলাশয়ের পাঁকমাটিতে লাগাবে, বর্ষার প্রথম গাছ লাগাবার সবচেয়ে ভাল সময়। এর পর থেকে প্রতি বছর বর্ষার প্রথমে জলাশয়ে কিছু গোবর ছিটিয়ে দিলে তা গাছের বাড়তি খাবার জোটাবে। পদ্মের কয়েকটি প্রজাতি পাওয়া যায়, কিন্তু একটি ছোট জলাশয়ে একটির বেশি প্রজাতি লাগিও না।

নতুন বাড়ি করার সময়ে ইট ভেজাতে একটি ছোট জলাশয় তৈরি করে নেওয়া হয়ে থাকে। এই জলাশয় থাকলে সেটি ব্যবহার করা যাবে অথবা এই ধরনের জলাশয় তৈরি করে নিতে হবে। জলাশয়ের জল যাতে নীচে থেকে সহজেই শুষে না যায় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রথমেই করতে হবে। এই জলাশয়ে প্রথমে সারমাটি বা পাঁকমাটি ফেলে তার পরে জল ভরে দেবে। জলাশয়ের বেলায় দুটি বিষয়ে খুব সাবধান

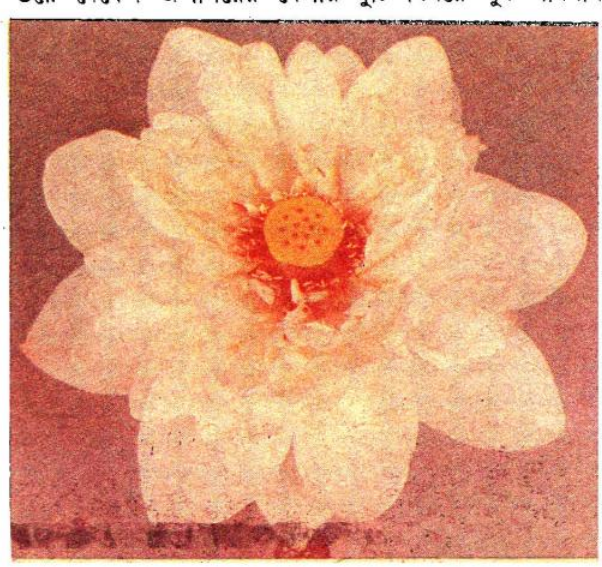

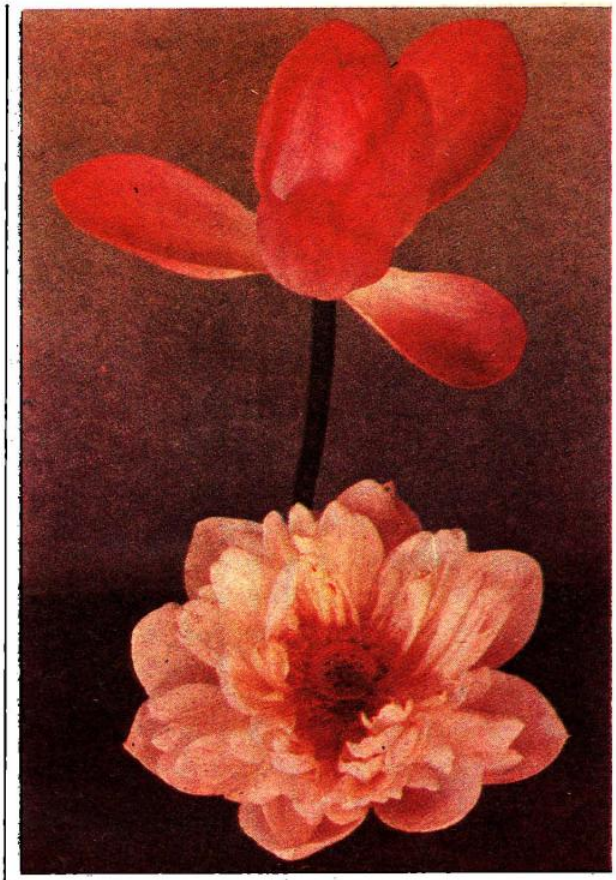

থাকবে : জলাশয় তারের নিচু জাল দিয়ে ঘিরে দেবে যাতে তার মধ্যে পড়ে যাবার কিছুমাত্র ভয় না থাকে। এবং দ্বিতীয়ত, এই জলাশয়ে গাপ্পি মাছ ছেড়ে দেবে যারা মশার ডিম খেয়ে নেবে।

পদ্মের উদ্ভিদবিজ্ঞানের নাম নিলামবিয়াম। আমাদের দেশের পদ্মের রঙ হয় গোলাপি অথবা সাদা। নীলপদ্ম বলে কিছু নেই। এদেশে গুটিচারেক ধরনের পদ্ম রয়েছে, ধরন অনুযায়ী রঙের বা পাপড়ির সংখ্যার কিছুটা তারতম্য দেখা যায়। এখানের বড় প ্ম তিরিশ সেমি ব্যাসের মতো বড় ফুল। পদ্মফুলের ডাঁটি সাধারণ বাঙালির থেকে দিঘল দু-মিটারের মতো লম্বা। পদ্মের এক ধরনের পাতা জলে ভাসে, অন্য ধরনের পাতা লম্বা ডাঁটির মাথায় জলের অনেকটা ওপরে প্রায় ফুলের কাছাকাছি চলে আসে। পাতায় জল পড়লে তা সহজেই গড়িয়ে পড়ে যায়। পদ্মের পাতা খুব বড় এবং এরও একটা আলাদা সৌন্দর্য রয়েছে। হালকা হলদে রঙের আমেরিকার পদ্ম (নিলামবিয়াম লিউটিয়া) এখানেও পাওয়া সম্ভব, এটির ফুল ও পাতা দুই-ই অপেক্ষাকৃত ছোট।

তিন দিন ধরে পদ্মফুলটি ফোটে। প্রথম দিন সকালে ফুলটি কিছুটা খুলে গুটিয়ে যায় ; দ্বিতীয় দিন সকালে একরকম পুরো খুলে আবার গুটিয়ে যায় ; তৃতীয় দিন সকাল থেকে ফুলটি পুরো খোলে এবং সাধারণত এই দিনেই এর পাপড়ি ঝরে যায়। সাদা পদ্ম গোলাপি পদ্মের থেকে বেশি সময় ধরে সুপ্রভ থাকে বলে মনে হয়। দ্বিতীয় দিনের ফুলে সকালে মৌমাছিরা ভিড় জমায়। এবং দ্বিতীয় দিনের পদ্মই পুষ্পসজ্জার পক্ষে সবচেয়ে ভাল।

পেনাল্‌টি

গ্যালারীতে ছিলেন দাদু, যেন ভিজে বেড়ালটি
হঠাৎ দারুণ লাফিয়ে উঠে হেঁকে বলেন, পেনাল্‌টি
অম্‌নি এমন কান্ড বাধায় ছোকরারা সব তুলকালাম
রেফারিটি বাজিয়ে বাঁশী বলেন, বাবা, থামরে থাম।
খেলা এখন শেষের পথে, বল রয়েছে মাঝ মাঠেই
কোন আক্কেলে বল্‌তো দাদা পেনাল্‌টি কিক্ মারতে দেই?
সবাই তখন ঘাবড়ে গেল, সত্যিই তো ঠিক কথাই
ফাউল টাউল কিচ্ছুটি নেই, ওঠে না এ প্রশ্নটাই।
বাগিয়ে ছাতা, লাফিয়ে দাদু, রেগে ভোলেন দিগ্বিদিক,
বুদ্ধু যত, নিচ্ছ মেনে? ভাবছ মনে এটাই ঠিক?
দেখলে না ঐ সূয্যি ব্যাটা করলে ফাউল অবিশ্রাম!
আহা কচি প্লেয়ারগুলোর দরদরিয়ে ঝরলো ঘাম!
হিসেব করে দেখলে কি কেউ এনার্জি ক্ষয় ক'বাল্‌টি
শুক্‌নো ত্বক আর ঝলসানো মুখ, তবুও কি নয় পেনাল্‌টি?
এই না বলে দাদু 'ফায়ার', বের করেন এক সবুজ টিউব
হাতে মুখে লাগা তোরা, বুড়ো হলেও নই বেকুব!
রোদের ক্ষতি পূরণ হবে, জিতবেই ঠিক আসছে দিন
ছেলেখেলা নয়কো বাবা! এর নাম হুঁ বোরোলীন!

কাটা-ছড়া ও ত্বকের সুরক্ষার জন্য

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৮৮

GDP-5241

ইজিচেয়ারের পাশে কে এসে দাঁড়িয়েছে ?

টমসাহেব

তারাপদ রায়

ছত্রিশ বছর চাকরি করার পর নন্দদুলালবাবু আজ চাকরি থেকে অবসর নিলেন। সরকারি চাকরি ছিল তাঁর। সেই কবে স্বাধীনতার পরে পরেই বাইশ বছর বয়েসে একটা মাঝারিগোছের কাজে ঢুকে পড়েছিলেন, দশ-বারোটা জেলা ঘুরে তিন-চারটে প্রোমোশন পেয়ে আটান্নয় এসে কলকাতার সদর অফিস থেকে রিটায়ার করলেন।

এর মধ্যে কত কাণ্ড ঘটে গেল। কী সুন্দর ঘন কালো চুল ছিল তাঁর, এখন মাথাভর্তি টাক, বাকি যে কয়েকটি চুল টাক ঘিরে নাচছে, সে-সবই সাদা ধবধবে। চাকরিতে ঢুকেছিলেন ধুতি-ফুলশার্ট পরে, গত কুড়ি বছর কোনো ধুতি পরেননি। প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট ছাড়া ভাবতেই পারেন না।

চাকরিতে ঢোকার পর বিয়ে হয়েছিল নন্দদুলালবাবুর। দুটি মেয়ে, এক ছেলে নিয়ে সুখের সংসার ছিল তাঁর। বছর-দুয়েক আগে স্ত্রী মারা গেছেন। মেয়েদুটির বিয়ে হয়ে গেছে। একটি থাকে বারাসাতে। অন্যটি একটু দূরে পাটনায় থাকে। ছেলেটিও তাঁরই মতো সরকারি কাজে ঢুকে এখন মফস্বলে আছে।

সবাই যেমন করে, শহরতলিতে একটা ছোট বাড়ি করেছেন নন্দবাবু। আজ বেলা দুটোর সময় তাঁরই বিদায় অভিনন্দন উপলক্ষে অফিস ছুটি হয়ে গেছে। অবশ্য ছুটির আগে মিনিট পনেরো-বিশের একটা ছোট বিদায়সভা হয়েছিল। সেখানে সহকর্মীরা কেউ-কেউ এবং অফিসের বড়সাহেব নন্দদুলালবাবুর সততা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি ভাল-ভাল গুণ নিয়ে দু-চার কথা বলেছেন। যা হয়ে থাকে এইরকম সব সভায়, তাই হয়েছে। অফিস তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল বলে অনেকেই একটু খুশিখুশি ভাব। তাঁদের আর দোষ কী ? নন্দবাবু নিজেও তো এইরকম দিনে খুশিই হতেন, যখন কেউ মারা গেছে বা চলে যাচ্ছে বলে অফিস ছুটি হত।

নন্দবাবুকে অবশ্য সহকর্মীরা শুধু শুকনো প্রশংসাবাক্য দিয়ে খালি হাতে বিদায় করেননি। একটা দামি ছাতা, একটা কাঁসার থালা, কয়েকটা বই, এক বাক্স সন্দেশ আর সেই সঙ্গে বড় একটা মোটা রজনীগন্ধার মালা নন্দবাবু উপহার পেয়েছেন বিদায়বেলায়।

সভা ভেঙে গেলে বড়সাহেব অফিসের সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন, তারপর অফিসের গাড়িতেই তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

সোয়া-তিনটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে গেছেন নন্দদুলালবাবু। খালি বাড়ি, ঠিকে-কাজের লোকটা পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটার আগে আসবে না। শূন্য ঘরে দরজা খুলে একা-একা ঢুকে আজ কেমন যেন খালি-খালি লাগল নন্দবাবুর। প্রায় প্রতিদিনই এমন খালিবাড়িতে কেটে যায় তাঁর, কিন্তু আজ শূন্য মনে হচ্ছে বাড়িটা। সেই কবে চাকরির ঘানিতে ঘাড় গলিয়েছিলেন তিনি, তারপর দিনের পর দিন চলে গেছে। কত ওঠা-নামা, কত সুখ-দুঃখ, কিন্তু কখনও নিজেকে এত নিঃসঙ্গ মনে হয়নি তাঁর।

বিদায়সভায় উপহার-পাওয়া জিনিসগুলো, ঘরের দরজা খুলে সামনের টেবিলটার উপরে রাখলেন নন্দদুলালবাবু। তারপর পাশেই একটা বেতের ইজিচেয়ার আছে, চেয়ারটা কিনেছিলেন কুড়ি বছর আগে যখন তিনি ঝাড়গ্রামে ছিলেন, তাতে বসে মাথাটা এলিয়ে দিলেন।

দুপুরে ঘুমনো অভ্যেস নেই নন্দদুলালবাবুর। এমনকী ছুটির দিনেও দুপুরে এই ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে তাঁর সময় কেটে যায়, চোখ বুজে যায় না। আজ কিন্তু চোখ বুজে এল।

ঠিক ঘুম নয়, ঘুমের মতো। আধো-ঘুম, আধো-তন্দ্রার মধ্যে পুরনো দিনের কত কথা, তাঁর সারা জীবনের নানা জায়গায় নানা কাজের টুকরো-টুকরো ছায়া-ছায়া সব ছবি চোখের পাতার মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল।

কোনোটা পঁচিশ বছর আগেকার, কোনো ছবি তিরিশ বছরের পুরনো—অথচ এখন এই আরামকেদারায় তন্দ্রাচ্ছন্ন শুয়ে নন্দদুলালবাবুর মনে হচ্ছে যেন গতকালের কথা, বড় জোর পরশু বা তার আগের দিনের ব্যাপার যেন সব।

সিনেমার ছায়াছবির মতো কত যে দৃশ্য ভেসে এল নন্দদুলালবাবুর চোখের পাতায়। ওই তো বুড়ো, কুচকুচে কালো লোকটা, কী যেন নাম ছিল, কালু বাগদি নাকি হারু

বাগদি, ইসলামপুরের অফিসঘরে বারান্দায় টুলের উপর বসে ঝিমোতে-ঝিমোতে টানাপাখার দড়ি টানছে। সে কবেকার কথা, তখনও ও-সব জায়গায় বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি।

তন্দ্রাটা একটু কেটে যেতে নন্দদুলালবাবু ভাবলেন, কালু বাগদি নিশ্চয় এতদিনে মরে গেছে আর টানাপাখা তো উঠে গেছেই। ইসলামপুরের কাছারিঘরের সামনে বিরাট বটগাছটা মনে পড়ল। তারপর কেমন যেন খটকা লাগল, বটগাছটা কোথায় ছিল—যার অনেক ঝুরি নেমে গেছে চারপাশে, বিকেলে পাড়ার ছেলেমেয়েরা এসে দোল খায়, সেটা কি ইসলামপুরেই, নাকি মুন্‌শিখানার পিছনে।

হেলান দিয়ে চোখ বুজে ভাবতে-ভাবতে নন্দদুলালবাবুর সামনে ভেসে এল বকের ঝাঁকের মতো হাজার-হাজার সাদা বকফুল, ছোট-ছোট গাছে গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুটে রয়েছে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তখন ট্রেজারি অফিসার তিনি, ট্রেজারিবাড়ির চারদিকে তারকাঁটার বেড়া ঘিরে লাগানো ছিল বকফুলের গাছ। তারকাঁটার বেড়া আর পুলিশগার্ড দেখে সেগুলো কেউ তুলতে আসত না। পুলিশ লাইনের সেপাই-জমাদাররা গাছ থেকে কিছু-কিছু ফুল তুলে ভেজে খেত। নন্দদুলালবাবু নিজেও কখনও-সখনও দু-চারটি ফুল বাড়ি নিয়ে গেছেন খাওয়ার জন্যে।

আর একটা কোথায় যেন, কোর্ট কম্পাউণ্ডের মধ্যের লাল সুরকি দেওয়া সড়কের দুপাশে সারি-সারি বকুলফুলের গাছ। বছরে অল্প কয়েকটা দিন বাদ দিয়ে প্রায় সব সময় ঝরে পড়ত রাশি-রাশি বকুল। গ্রীষ্মকালে লাল সুরকির রঙ ঢাকা পড়ে যেত সাদা বকুলে।

অনেক কাল আগের রাশি-রাশি বকুলফুলের ভেসে আসা সুদূর মৃদু সৌরভে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন নন্দদুলালবাবু। এবার ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলেন।

তারপর কতক্ষণ কেটেছে ঠিক নেই। হঠাৎ নন্দবাবু দেখলেন, তাঁর ইজিচেয়ারের পাশে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। কোট-প্যাণ্ট-টাই পরা, চেহারাটা খুব চেনা-চেনা, হাতে একটা স্যুটকেস।

নন্দদুলালবাবু চট করে ঠাহর করে উঠতে পারলেন না। সাহেব কোনো ওপরওলা নাকি! কিন্তু তারই মধ্যে তাঁর খেয়াল হল, তিনি তো কোনো সাহেবের কাছে খুব একটা কাজ করেননি, ইংরেজ বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কোনো ওপরওলার অধীনে কখনও ছিলেন না, সারাটা জীবন প্রায় বাঙালি-বাঙালিতেই গেছে, একবার একটা মাদ্রাজি আর একবার এক গুজরাটি ওপরওলা ছিল বটে, তবে সেও দূর থেকে।

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎই তিনি চিনে ফেললেন সাহেবকে, আরে এ তো টমসাহেব। ঝাড়গ্রামের টমসাহেব। হ্যাঁ ঝাড়গ্রামেরই, খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন টমসাহেবের সঙ্গে তিনি।

কিন্তু টমসাহেব জামাকাপড় পরে, স্যুটকেস হাতে এসেছেন কেন? ধড়মড় করে ঘুমটা ভেঙে গেল নন্দদুলালবাবুর, টমসাহেবের স্বপ্নটা তখনও চোখে লেগে রয়েছে।

চোখ বন্ধ করে রেখে অনেকক্ষণ স্বপ্নটাকে চোখের পাতার মধ্যে ধরে রাখলেন নন্দদুলালবাবু।

টমসাহেবের সমস্ত কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। ঝাড়গ্রামে থাকতে একটা আধ-বিলিতি কুকুরছানা তাঁকে দিয়েছিলেন এক সহকর্মী। সেই কুকুরছানাটা তিনি পুষেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন টম। সাহেবদের মতো স্মার্ট চালচলন ছিল কুকুরটার। যত বড় হতে লাগল তত তার সাহেবিয়ানা ফুটে উঠতে লাগল, আদর করে নন্দদুলালবাবু তাকে ডাকতেন 'টমসাহেব' বলে, আবার কখনও বা 'মিস্টার টম'ও বলতেন।

টম, টমসাহেব, মিস্টার টম যে নামেই ডাকুন না কেন নন্দবাবু, নন্দবাবুর প্রতি টমের আনুগত্য, ভালবাসা অপরিসীম ছিল। একটা ছোট লেজ যে অত দ্রুত নড়তে পারে, একটা সামান্য কুকুর মানুষের অত বাধ্য হতে পারে নন্দদুলালবাবু আগে কখনও জানতেন না।

তখনও নন্দদুলালবাবুর বিয়ে হয়নি। তাঁর দিনরাতের অবসর সময় মোটামুটি কেটে যেত টমের সঙ্গে খেলা করে, টমকে আদর করে।

ঝাড়গ্রাম থেকে যখন মাথাভাঙায় বদলি হলেন নন্দদুলালবাবু সেই টমকে ছেড়ে আসতে হয়েছিল। আসার দিন গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে, 'তুই তো মানুষ নোস, তুই তো জামাকাপড় পরিস না, তোর তো বাক্স-বিছানা মালপত্র নেই, তোকে তো ট্রেনে উঠতে দেবে না, তোকে এখানে নরেনবাবুর কাছে রেখে যাচ্ছি। পরে একবার একটা গাড়ি যোগাড় করে তোকে এসে নিয়ে যাব'—এই সব বুঝিয়েছিলেন।

টম যেন সব বুঝতে পেরেছিল। একজন আর্দালির সঙ্গে ঝাড়গ্রাম স্টেশন পর্যন্ত নন্দদুলালবাবুকে তুলে দিতে টম এসেছিল। নন্দদুলালবাবুও বুঝতে পেরেছিলেন, এই তার পরম স্নেহের টম, প্রিয় টমসাহেব, ওর সঙ্গে আর জীবনে হয়তো দেখা হবে না। ঝাড়গ্রাম থেকে মাথাভাঙা, একটা গাড়ি সংগ্রহ করে কুকুর নিয়ে যাওয়া কিংবা ট্রেনে বুক করে নিয়ে যাওয়া একজন ছোট সরকারি চাকুরের পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না।

ট্রেন ছেড়ে দিলে করুণ নয়নে টমসাহেব চলমান গাড়িটার দিকে তাকিয়েছিল। গাড়ির জানলা দিয়ে নন্দদুলালবাবু আর্দালিকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "টমকে যেন রাস্তায় ছেড়ে দিসনে। নরেনবাবুর বাড়িতে একদম ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর তুই যাবি।"

ঝাড়গ্রাম কি আজকের কথা, চৌত্রিশ বছর হল। প্রথম চাকুরিতে ঢুকেই ঝাড়গ্রাম।

সেই ঝাড়গ্রামের টম, টমসাহেব। এতদিন পরে জামাকাপড় পরে, দু'পায়ে দাঁড়িয়ে, হাতে স্যুটকেস নিয়ে মানুষ হয়ে এসেছে। নন্দবাবুকে সে ছাড়বে না, নন্দবাবুর সঙ্গে সেও থাকবে, ঘুরবে, রেলগাড়িতে যাবে।

চোখ খুললেন নন্দবাবু। না টম নয়, টমসাহেব কোথাও নেই। সাড়ে-পাঁচটা বোধহয় বেজে গেল, ইজিচেয়ারের হাতায় অল্প রোদ বিকেলের হলুদ রঙ মেখে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কে যেন বাইরের দরজায় কড়া নাড়ছে, ঠিকে-কাজের লোকটা বোধহয় এল।

ইজিচেয়ার থেকে উঠে যেতে যেতে এবার ইজিচেয়ারটার ডানপাশে তাকালেন নন্দদুলালবাবু, ঠিক ওইখানটায় টম এসে দাঁড়িয়েছিল এতদিন পরে।

ছবি দেবাশিস দেব

কে কীভাবে চুরি করেছে সিল-করা খাম ?

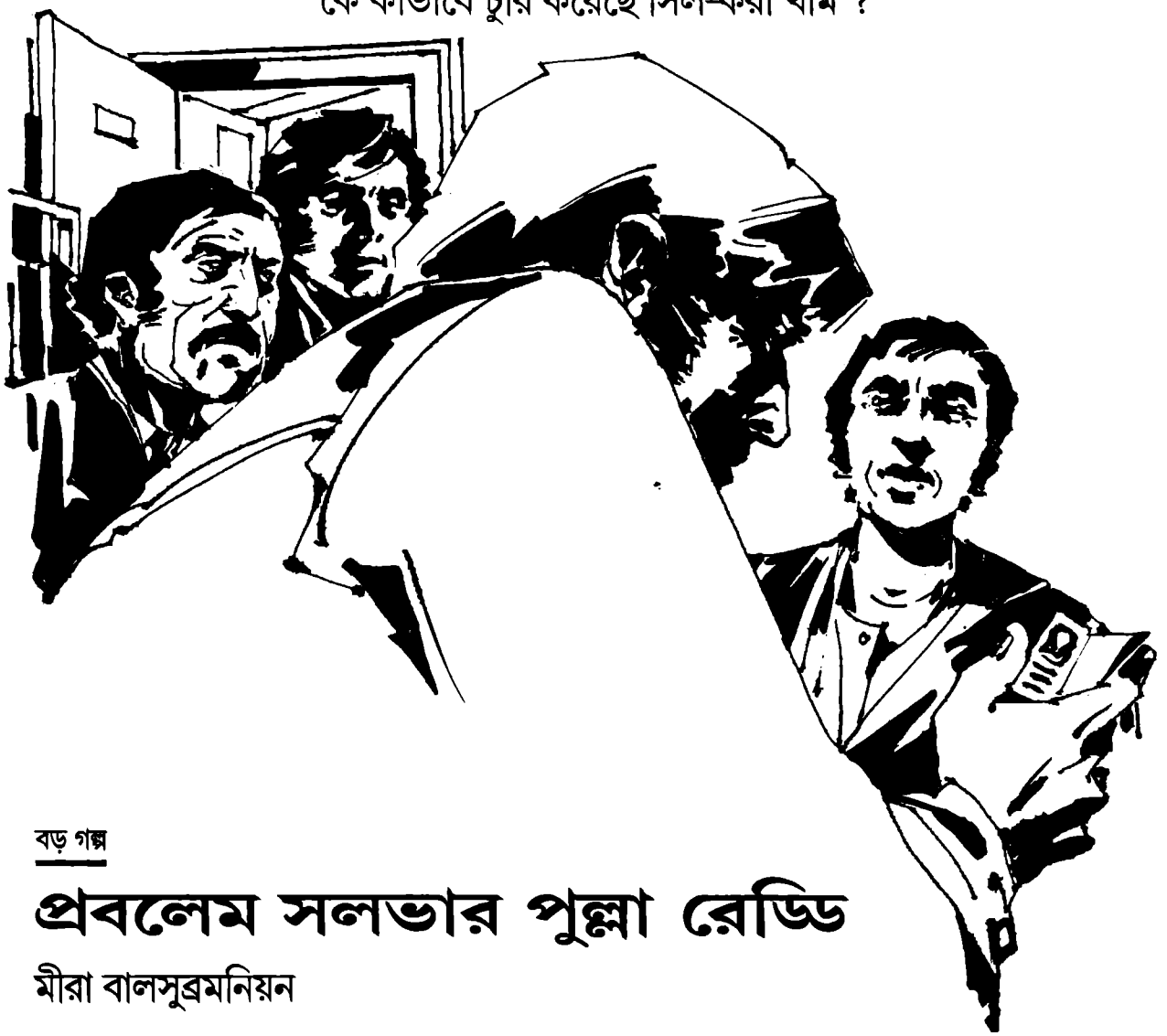

বড় গল্প

প্রবলেম সলভার পুল্লা রেড্ডি

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

মেজকার বন্ধু পুল্লা রেড্ডির আজকাল বেশ নাম-ডাক হয়েছে শখের গোয়েন্দা হিসেবে, যদিও পুল্লা রেড্ডি নিজেকে একজন 'প্রবলেম সলভার' ছাড়া কিছু বলেন না। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি বা প্রবলেম সলভিং কোনোটাই পুল্লা রেড্ডির পেশা নয়, নেশা মাত্র। ওঁর (এবং মেজকারও) পেশা হচ্ছে সরকারি চাকরি। অর্থাৎ লালফিতের জগতে বিচরণ।

পুল্লা রেড্ডির মনে কিন্তু একটু খেদ ছিল এই জন্য যে, ওঁর এই নেশার দরুন যেটুকু নামডাক হয়েছে, সেটা ওঁর সরকারি অফিসের জগতে ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। ওঁর সহকর্মীরাও (মেজকা বাদে) এমন ভাব দেখাতেন যে, যে-ক'টা রেজিস্টার ও ফর্মের ইন্-চার্জ উনি, তার বাইরে পুল্লা রেড্ডির কোনো অস্তিত্বই নেই।

মেজকা অবশ্য ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, "তুমি মনখারাপ কোরো না রেড্ডি, আমাদের দেশে প্রবাদই রয়েছে—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।"

ওঁদের কথার মাঝখানে কথা বলে ফেলেছিলাম সেদিন, "মেজকা, তোমাদের ডিপার্টমেণ্টেই যদি কোনো প্রবলেম হয়, তাহলে তো রেড্ডিকাকুকেই ডাকতে হবে, তাই না ?"

আমার কথাটা কিন্তু ফলে গিয়েছিল। সেই কথাই বলছি এবার।

সেদিনটা ছিল রোববার। সাধারণত রোববারের সকালে পুল্লা রেড্ডি মেজকার ওখানে আসেন আড্ডা দিতে। আসি আমিও। ব্যাচেলার মেজকার বাড়িতে কোনো ঝামেলা নেই। ওঁর ভৃত্যটিও আমাদের চা-কফি তৈরি করে দেবার বা গরম গরম পাকোড়া ভেজে দেবার জন্য এক পায়ে খাড়া। অতএব আড্ডার জন্য মেজকার বাড়িই প্রশস্ত।

সেদিন আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল আগামী পুজোর ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায়। হিমাচল প্রদেশ না গোয়া, এই নিয়ে তর্ক চলছে, এমন সময় মেজকার ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল।

"ইশ্, এখন আবার কে ফোন করছে ! ডিসকাশনটা মাটি করে দিল !" বলে উঠে ফোন ধরলেন মেজকা, এবং দু'চারবার হুঁ-হাঁ করে এসে বললেন, "রেড্ডি, তোমার ফোন। গলাটা একটু চেনা-চেনা মনে হল যেন।"

রেড্ডি ফোন ধরতে উঠে গেলেন। আমি আর মেজকা

কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি সার্ফ কেনেন!

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কারণ সার্ফ-এর ওপর খরচ হওয়া একেকটি পয়সা তার প্রভাব দেখিয়ে দেয়। সেজন্যে, যদি আপনি দিলদরিয়া হয়ে খরচ না ক'রে একটু চোখ খুলে খরচ করেন, তাহলে সার্ফ-ই কিনবেন।"

কিন্তু, সস্তার পাউডার কেনায় তো পয়সার দারুণ সাশ্রয় থাকে!

"একদম নয়, কারণ সস্তার জিনিষ আর ভাল জিনিষ কেনায় তফাৎ থাকে। সার্ফ-এর সঙ্গে সস্তার পাউডার কি মোকাবিলা করতে পারে? মেপে-জুপে হিসেব করলে দেখবেন, সার্ফ কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

সার্ফ কেনাই কেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

"তাহলে শুনুন, সস্তার পাউডারের পুরো এক কিলোর থলিতে যতটা পাউডার থাকে, সার্ফ-এর শুধু ১/২ কিলোর ডিবেতে থাকে ঠিক ততটা পাউডার।"

কিন্তু তবু…

"প্রশ্নই ওঠেনা—কারণ, সবদিক দিয়ে সার্ফ-এর পাল্লাই ভারী হবে। তাছাড়া, যে কোনো সস্তার পাউডার কি সার্ফ-এর মত কাপড়ে এমন শুভ্রতা আনতে পারে? রঙীন কাপড়ে আনতে পারে এমন ঝলমলে চমক? শুধু সার্ফ-ই এক এমন পাউডার, যা দিয়ে ধুলে কাপড় দেখায় সদা নতুনের মত …বারবার ধোয়ার পরও।"

আপনি ঠিকই বলেছেন…

"আর হ্যাঁ, সার্ফ আমার ত্বকেরও কোনো ক্ষতি করে না—মানে, আমার হাত থাকে একেবারে সুরক্ষিত।"

এবার বুঝলাম, সার্ফ লাভের সওদা কেন?

"সত্যি, তাইতো মাসে মাসে তুচ্ছ কয়েকটা পয়সা বাঁচানোর জন্যে সার্ফ-কে আমি কোনোমতেই ছাড়তে রাজী নই। আরে ভাই, পয়সা বাঁচানোই নয়, বুদ্ধিমানের কাজ হ'ল ভেবে-চিন্তে খরচ করা।"

মেপে-জুপে সব যাচাই করলাম, সার্ফ-এর সওদাই সেরা মানলাম।

LINTAS SU 320 2619 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

দুটো খবরের কাগজ টেনে পাতা ওলটাতে লাগলাম।

একটু পরেই ফিরে এলেন পুল্লা রেড্ডি। বেশ হাসি-হাসি মুখ। মেজকাকে বললেন, "বোস, তুমি বলছিলে না গলাটা চেনা-চেনা ঠেকছে? ঠেকবেই তো! মুখার্জিসাহেব ফোন করেছিলেন। এখানে আসছেন মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যেই।"

"মুখার্জিসাহেব!" মেজকার ভুরু কুঁচকে গেল। "কোন্ মুখার্জিসাহেব?"

আমি বলে উঠলাম, "মেজকা, ইনি তোমাদের বস মিঃ মুখার্জি নন তো?"

পুল্লা রেড্ডি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, তিনিই বটে। তবে শুধু বস নন, একেবারে টপ বস।"

মেজকা বললেন, "অ্যাঁ? আমাদের মুখার্জিসাহেব? এখানে আসছেন? কেন?"

"ওঁর নাকি কী একটা প্রবলেম হয়েছে," পুল্লা রেড্ডি বললেন, "আমার বাড়িতে ফোন করেছিলেন। সেখান থেকেই এখানকার ফোন নম্বর পেয়েছেন। উনি অবশ্য জানেন না যে, এটা তোমার বাড়ি।"

মেজকা উঠে বললেন, "জানুন বা না-জানুন, এলে খাতির-যত্ন করতে হবে তো! যাই, একটু মিষ্টি আনাবার বন্দোবস্ত করিগে। রণ্টু, কী আনাব বল তো? রসগোল্লা না সন্দেশ? না দুটোই?"

পুল্লা রেড্ডি বাধা দিয়ে বললেন, "ব্যস্ত হোয়ো না বোস। মিঃ মুখার্জিকে খুব চিন্তিত মনে হল। সন্দেশ-রসগোল্লা খাবার মতো মনের অবস্থা ওঁর নাও থাকতে পারে।"

মিঃ মুখার্জি এসে গেলেন একটু পরেই। হ্যাঁ, টপ বসের মতো জাঁদরেল চেহারাই বটে। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, পুরুষ্টু গোঁফ, কিন্তু একদিকে ঝুলে আছে। অর্থাৎ সকালে উঠে গোঁফের পরিচর্যা করা হয়নি। চোখেমুখে দুশ্চিন্তার কালি। পরনের সাফারি সুট কোঁচকানো।

মেজকাকে দেখে মিঃ মুখার্জি বললেন, "আরে, আপনি যে?"

"আজ্ঞে, এটা আমারই বাড়ি!" বিনীতভাবে জবাব দিলেন মেজকা।

"আর এই ছেলেটি?" আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন মিঃ মুখার্জি।

"এ হচ্ছে রণ্টু," পুল্লা রেড্ডি পরিচয় দিলেন, "বোসের ভাইপো। আমাদের প্রবলেম সলভিং-এ সাহায্য করে। জানেন বোধহয়, নানা ধরনের প্রবলেম সলভ্ করা আমার একটা হবি? বোস আর রণ্টু আমার সঙ্গেই আছে।"

মিঃ মুখার্জি একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, "হ্যাঁ, আপনার হবির কথা শুনেছি বটে। ইন ফ্যাক্ট, সে-জন্যই এখানে আসা। আপনার মানে, আপনাদের সাহায্য চাই।"

"উই আর অ্যাট ইয়োর সার্ভিস, স্যার," পুল্লা রেড্ডি বললেন, "বলুন, কী হয়েছে ...."

দেখলাম অমন একজন জাঁদরেল অফিসারও কথা শুরু করতে পারছেন না, আমতা-আমতা করছেন। পুল্লা রেড্ডি বললেন, "একেবারে গোড়া থেকে শুরু করুন স্যার। ব্যাপারটা বুঝতে সোজা হবে।"

খানিক কেসে গলা পরিষ্কার করে মুখার্জি কথা শুরু করলেন।

"আপনারা বোধহয় জানেন যে, খুব বড়দরের না হলেও আমাদের সরকারেরও একটা ইন্টেলিজেন্স উইং আছে। জানেন? তাহলে এটাও বোধহয় জানেন যে, অনেক সময় এই ইন্টেলিজেন্স উইং-এর নির্দেশ আর হুকুমনামা সোজাসুজি ডাকে না পাঠিয়ে দূত মারফত পাঠানো হয়? আর প্রায়ই এসবের বাহক হন এমন লোক যাঁর সঙ্গে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের কোনোই সম্বন্ধ নেই ..."

আমি মেজকাকে কানে কানে বললাম, "ব্যাপারটা এক্সাইটিং হতে পারে মনে হচ্ছে।"

"কয়েকদিন আগে হঠাৎ দিল্লি যাবার ডাক এল," ফের শুরু করলেন মুখার্জি, "একটা জরুরি মিটিং আছে নাকি। যথারীতি গেলাম সেখানে। কিন্তু মিটিং-এ যোগ দিয়ে বুঝতে পারলাম যে, ওটা সত্যিই এমন কিছু জরুরি নয়। একটা আর্জেন্ট মেমো কি ট্রাংককলেই কাজ সারা যেত। তার বদলে আমার প্লেনে যাওয়া-আসার ভাড়া, ডেইলি অ্যালাওয়েন্স খরচ হল। এমন না হলে আর সরকারি অফিস। পেনি ওয়াইজ পাউণ্ড ফুলিশ।

"মিটিংয়ের শেষে এইসব ভাবছিলাম, এমন সময় অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারির ঘরে ডাক পড়ল। ওঁর সঙ্গে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সরাসরি কোনো যোগ নেই। তাই একটু অবাক হলাম। ওঁর চেম্বারে যাওয়ার আগে অবশ্য ওঁর পি· এ·, অর্থাৎ পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টের ঘরে বসতে হল কিছুটা। তারপর আমার ডাক পড়ল। দু' একটা সাধারণ কথা বলে অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারি আমাকে ডাকার আসল উদ্দেশ্যটা জানালেন। সেটা হচ্ছে, ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের একখানা সিল করা চিঠি আমাকে নিয়ে আসতে হবে। আসাম সীমান্ত থেকে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন সোমবার, অর্থাৎ আগামীকাল। ওঁর হাতেই দিয়ে দিতে হবে চিঠিটা। 'মিঃ মুখার্জি,' অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারি বললেন, 'বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা খুবই জরুরি ও গোপনীয়। আপনার বিশ্বস্ততার ওপর আমাদের আস্থা আছে—এজন্যই ব্যাপারটার ভার আপনাকে দেওয়া হয়েছে। আশা করি আমাদের নিরাশ হতে হবে না। আমার পি· এ· আপনাকে চিঠিটা দেবে।'

"চলে আসার আগে অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারি আবার বললেন, 'চিঠিখানা সাবধানে নেবেন, কিন্তু এমন ভাব দেখাবেন না যাতে বাইরের কেউ বুঝতে পারে যে, আপনি কোনো জরুরি ও গোপনীয় কিছু নিয়ে যাচ্ছেন।'

"ওঁর পি· এ·'র ঘরে ফের বসতে হল কিছুক্ষণ। ওখানে আরও ক'জন ছিলেন। অল্পক্ষণ পরে পি· এ· এসে আমার হাতে একখানা ব্রাউন রঙের সিল-করা খাম দিলেন। আমি ওখানা আমার ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে নিলাম। এটা হচ্ছে শুক্রবার বিকেলের কথা। শনিবারের ভোরের প্লেনে আমার কলকাতা ফেরার কথা। অফিস থেকে বেরিয়ে আমি সোজা গেস্ট হাউসে চলে আসি এবং চিঠিসমেত ব্রিফকেস গেস্ট হাউসে আমার ঘরেই থাকে। সন্ধেটা নিজের ঘরেই বই পড়ে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। রাত্রের খাবারও নিজের ঘরেই খেয়েছি। এত ডিটেল কেন বলছি, পরে বুঝতে পারবেন। পরদিন ভোরে কলকাতার প্লেন ধরলাম। প্লেনে ব্রিফকেস আমার সঙ্গেই ছিল। দমদম পৌঁছেও ব্রিফকেস হাতছাড়া হয়নি একবারও। আর এয়ারপোর্ট থেকে নেমে অফিসের গাড়িতে সোজা বাড়ি

চলে যাই। স্নান খাওয়া শেষ করে ভাবলাম, এবার চিঠিটা বার করে বাড়ির গোদরেজের আলমারিতে রাখি, কারণ সোমবারে বাড়ি থেকেই চিঠিটা নিয়ে যাবেন সেই নির্দিষ্ট ভদ্রলোক।

"কিন্তু ব্রিফকেস খুলে দেখি সেই চিঠিটা নেই। আমার টাকাপয়সা, মিটিংয়ের অন্য কাগজপত্র, সবই ঠিক-ঠিক আছে, নেই শুধু ব্রাউন রঙের সিল-করা খামটা।"

পুল্লা রেড্ডি ভুরু কুঁচকে বললেন, "আর কালই আসামের সেই ভদ্রলোকের এসে চিঠিখানা নিয়ে যাওয়ার কথা তো, তাই না?"

"হ্যাঁ, আর চিঠিটা না দিতে পারলে কী হবে বুঝতেই পারছেন ..."

পুল্লা রেড্ডি কী যেন চিন্তা করতে লাগলেন। দু' এক মিনিট উশখুশ করে মিঃ মুখার্জি উঠে পুল্লা রেড্ডির পাশে সোফায় এসে বসে রেড্ডির হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, "মিঃ রেড্ডি, প্লিজ ... আপনার ক্ষমতা সম্বন্ধে শুনেছি অনেকের কাছেই ... আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। চিঠিটা না পাওয়া গেলে শুধু যে আমার প্রেস্টিজই যাবে তা নয়, চাকরিও যেতে পারে।"

মেজকা বললেন, "আপনি ভাববেন না স্যার, রেড্ডি ঠিক খুঁজে বার করবে চিঠিখানা।"

রেড্ডি মাথা নেড়ে বললেন, "অতখানি আশ্বাস দিতে পারছি না। আফটার অল, চিঠিটা খোয়া গেছে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগে। তাও এখানে নয়।"

মেজকা জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে নয় কেন বলছ? ব্রিফকেসটা বাড়ি নেবার পরেও তো চিঠিটা চুরি হতে পারে। বাড়িতে নিশ্চয়ই চাকর-বাকর ছিল ..."

রেড্ডি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে মিঃ মুখার্জির দিকে তাকালেন। মিঃ মুখার্জি মাথা নাড়লেন। বললেন, "সেটা মনে হয় না। এক নম্বর— জানেন তো আজকালকার ব্যাপার—সব বাড়িতেই ঠিকে-ঝি'র কারবার। সেই ঠিকে-ঝি আমি বাড়ি পৌঁছবার আগেই কাজ সেরে চলে গিয়েছে। রাঁধুনি একজন আছে অবশ্য, কিন্তু সে অনেক দিনের পুরনো আর বিশ্বাসী। তাছাড়া বাঙালি বুড়ি বিধবা; এসব চিঠির মর্মই বা বুঝবে কোথা থেকে। তার ওপর ভাঁড়ার-ঘর আর রান্নাঘর ছাড়া অন্য দিকে ও বড় একটা আসে না। সেদিনও আসেনি। সেইজন্যই বলছি, কলকাতায় আসার পর চিঠিখানা চুরি হয়েছে এটা বিশ্বাস করা কঠিন।"

আমার মাথায় হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে গেল। মেজকাকে বললাম, "আচ্ছা, চিঠিটা যে চুরিই হয়েছে, এমন নাও হতে পারে তো ..."

তিনজোড়া চোখ আমার মুখের ওপর আটকে গেল। তিনজনাই সমস্বরে প্রশ্ন করলেন, "তার মানে?"

তিনজনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে পড়ে একটু ঘাবড়ে গেলাম বইকী। তবু মাথা ঠিক রেখে বললাম, "মানে যদি চিঠিটা গোড়াতেই মিঃ মুখার্জির কাছে না থাকে? ধরা যাক অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারির পি. এ.-ই শত্রুপক্ষের লোক। উনি যদি চিঠিখানা না দিয়ে একটা 'ডামি' এনভেলাপ সিল করে দিয়ে থাকেন? এরকম হতেও তো পারে ..."

মেজকা আমার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "বেশ ভাল পয়েন্ট বার করেছে তো রন্টু! রেড্ডি, তুমি কী বলো?"

আমি আশা করেছিলাম পুল্লা রেড্ডি অন্তত আমার পিঠটা একটুখানি চাপড়ে দেবেন। কিন্তু উনি শুধু মুচকি হেসে বললেন, "তাই যদি হবে তবে ডামি খামটা অন্তত ব্রিফকেসে থাকবে। মিঃ মুখার্জি কি ব্রিফকেসে খামটা পেয়েছিলেন?"

মিঃ মুখার্জি বললেন, "না তো, গোটা খামখানাই তো ব্রিফকেস থেকে উধাও।"

"তা ছাড়া," পুল্লা রেড্ডি ফের বললেন, "পি· এ· যদি শত্রুপক্ষের চরই হবেন, তাহলে তো চিঠিখানা মিঃ মুখার্জিকে দেবার আগেই নকল করে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। চিঠি দিয়ে আবার সেটা চুরি করার কী দরকার?"

না, প্রবলেম সলভিং অত সোজা নয় দেখছি। মাথা চুলকে বললাম, "এ-দিকটা একদম ভেবে দেখিনি।"

রেড্ডি তখন মুখার্জির দিকে ফিরে বললেন, "তবে রন্টু একটা ব্যাপার ঠিকই ধরেছে। অর্থাৎ ব্যাপারটার সূত্র এখানে নয়, দিল্লিতে। এখানে বসে সে-সূত্র ধরা কঠিন।"

"আপনি কি দিল্লি যেতে চান? কিন্তু কাল যে আমার চিঠিখানা দেবার কথা?"

"না, দিল্লি যাবার সময় নেই," মাথা নাড়লেন রেড্ডি। "তবে গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে চাই। দিল্লিতে যখন আপনি অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারির পি. এ.-র ঘরে বসে ছিলেন,তখন সেখানে ক'জন ছিল ? তাদের কাউকে আপনি চেনেন ?"

মিঃ মুখার্জি একটু চিন্তা করে বললেন, "পি. এ.-র ঘরে আমি দুবার বসেছিলাম। প্রথমবার অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করার আগে ও দ্বিতীয়বার যখন চিঠির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। দু'বারই ঘরে বেশ ক'জন লোক ছিলেন। তবে ঠিক সংখ্যা বলতে পারব না। দেখে এবং কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল, সবাই কোনো-না-কোনো কাজে এসেছেন। কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়নি এক মিঃ পাত্র ছাড়া।"

"মিঃ পাত্র ? উনি কে ?"

"কোম্পানি ল' ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার। কলকাতায়ই আছেন এবং আমার সঙ্গে সামান্য পরিচয়ও আছে। বদলির তদ্বির করতে দিল্লি গিয়েছিলেন।"

"ওঁর সঙ্গে কী কথা হয়েছিল সেখানে ?"

"বিশেষ কিছু নয়, এই কেন এসেছি, কবে ফিরব ইত্যাদি। মিঃ পাত্র অবশ্য বলেছিলেন উনি কয়েকদিন থাকবেন, তাই পরদিন ভোরে প্লেনে ওঁকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।"

"প্লেনেও ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি ?"

"হ্যাঁ। তবে "

বাধা দিয়ে পুল্লা রেড্ডি বললেন, "পি· এ· যখন চিঠিটা দেন, তখন মিঃ পাত্র ছিলেন কি ?"

"ছিলেন বইকী। আর যদ্দুর মনে আছে, বেশ ড্যাবড্যাব করে লক্ষ করেছিলেন ব্যাপারটা।"

"ওঁকে চিঠির ব্যাপারটা বলেননি তো ?"

"নিশ্চয়ই না।"

"চিঠিটা নিয়ে কী করলেন আপনি ?"

"কী আর করব, তক্ষুনি ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর মিঃ পাত্রকে একবার বাই বাই করে গেস্ট হাউসে চলে এলাম। পথে কোথাও থামিনি। গেস্ট হাউসে ফিরেছি অফিসের গাড়িতেই, এবং এটুকু বলতে পারি যে, গেস্ট হাউসে কেউ আমার ব্রিফকেসে হাত দেবার সুযোগ পায়নি। কারণ সারা সন্ধে আমি ঘরেই ছিলাম। ডিনারও খেয়েছি ঘরেই। আর বাথরুমও ঘরের লাগোয়া। আর পরদিন ভোরে তো ছ'টা নাগাদ রওনাই হয়ে গেলাম, কারণ প্লেন ছিল সাতটায়।"

"যাওয়ার আগে ব্রিফকেস খুলেছিলেন কি ?"

"নিশ্চয়ই। টাকাপয়সা, এয়ার টিকেট এসব বার করলাম তো। তবে যদি চিঠিটার কথা বিশেষ করে জিজ্ঞেস করেন তো বলি যে, লক্ষ করিনি ওটা ছিল কি না। আসলে অন্যসব কাগজপত্রের নীচে একটু সাবধানে রেখেছিলাম চিঠিখানা।"

"এবার প্লেনে কী হল বলুন। কোথায় বসলেন ? আপনার পাশে কে বসেছিলেন ? ব্রিফকেস কি সঙ্গেই রেখেছিলেন ? প্লেনে কি সিট ছেড়ে উঠেছিলেন কখনও ?"

মুখার্জি বললেন, "দাঁড়ান, ভাবতে দিন, অতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করবেন না।"

রেড্ডি বললেন, "স্যার, আপনিই তো বললেন যে, সময় কম, কাল লোক আসবে চিঠিখানা নিতে। তাহলে একটু তাড়াহুড়ো না করলে চলবে কী করে ?"

"ঠিক আছে, বলছি।" জবাব দিলেন মুখার্জি।

"এয়ারপোর্টে এসে চেক-ইন করে সিকিউরিটি লাউঞ্জে চলে যাই। ব্রিফকেস সঙ্গেই ছিল। ওখানে অবশ্য যথারীতি তল্লাশি করেছিল সিকিউরিটি স্টাফ। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ওরাই "

মাথা নেড়ে রেড্ডি বললেন, "সম্ভব নয়। ওরা কী করে জানবে এই চিঠির ব্যাপার ?"

"তাও তো বটে। হ্যাঁ, সেদিন প্লেন সময়েই ছেড়েছিল। নিজের সিটে বসে আমি ব্রিফকেসটা যথারীতি পায়ের কাছে রেখে দিয়েছি। না, জানলার ধারের সিট আমার ছিল না। ও সিটে বসেছিল একটি আট-ন বছরের মেয়ে। আমরা ছিলাম প্লেনের সামনের দিকটায়। মেয়েটির মা বসেছিলেন পেছনের দিকে একটা সিটে। ওদেরকে আমি চিনি না।"

"মিঃ পাত্রর সঙ্গে কখন দেখা হল ?"

"বলছি। টেক অফের অল্প আগে পাত্র এসে প্লেনে ওঠেন। ওঁর নাকি ট্যাক্সির চাকা পাংচার হয়ে গিয়েছিল। আমার সিটের পাশ দিয়ে যাবার সময় বললেন, 'হ্যালো, মুখার্জি, আমার জন্য জায়গা আছে ?' আমি পাশে বসা

মেয়েটিকে দেখিয়ে দিলাম। পাত্র বললেন, 'হোয়াই ডোন্ট উই একসচেঞ্জ ? তাহলে গল্প করা যাবে।' আমি মেয়েটিকে দেখিয়ে বললাম, 'এর মা প্লেনের পেছনের দিকে বসেছেন ওঁকে জিজ্ঞেস করুন।' মেয়েটির কাছ থেকে ওর মার নাম জেনে মিঃ পাত্র এগিয়ে গেলেন। তারপর আধ ঘণ্টাটাক বাদে মেয়েটির সঙ্গে সিট বদল করে আমার পাশে চলে এলেন উনি। অবশ্য আমি তখন জানলার সিটে চলে যাই।"

"আপনি বলেছিলেন যে, মিঃ পাত্রর আরও দু' একদিন থাকার প্রোগ্রাম ছিল। হঠাৎ উনি এভাবে চলে এলেন, এটা আপনার সন্দেহজনক মনে হয়নি ?"

মুখার্জি বললেন, "আপনি কি মিঃ পাত্রকে সন্দেহ করছেন নাকি ?"

রেড্ডি মন্তব্য করলেন, "আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না ..."

"বলছি। হ্যাঁ, পাত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ব্যাপারটা। উনি বলেছিলেন বাড়িতে কী দরকার পড়েছে, ট্র্যাংকল পেয়ে আসা ঠিক করেছেন। আর সন্দেহের কথা যদি বলেন, তখন তো আর জানি না যে, চিঠিটা চুরি হচ্ছে, তাই সন্দেহের কথা মনেই জাগেনি।"

"পাত্র থাকাকালীন আপনি সিট ছেড়ে উঠেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। ব্রেকফাস্ট খাবার পর বাথরুমে গিয়েছিলাম।"

একটু চিন্তা করে রেড্ডি বললেন, "যদ্দুর মনে হচ্ছে, মিঃ পাত্রই চিঠিখানা সরিয়েছেন।"

মিঃ মুখার্জি সামান্য প্রতিবাদের সুরে বললেন, "কিন্তু মিঃ পাত্র তো চিঠির ব্যাপার আগে থেকে জানতেন না। ওঁর সঙ্গে পি·এ·-র ঘরে আমার দেখা হওয়াটা তো নেহাতই যোগাযোগের ব্যাপার।"

এতক্ষণ চুপ করে থেকে মেজকা উশখুশ করছিলেন। এবার বলে বসলেন, "কিন্তু স্যার, এমনও তো হতে পারে যে, শত্রুপক্ষই আপনার ওপর নজর রাখতে মিঃ পাত্রকে পাঠিয়েছিল ?"

রেড্ডি মাথা নেড়ে বললেন, "না, বোস, সে বিষয়ে এখনই ঠিক করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে এটা মনে হচ্ছে যে, চিঠিটা মিঃ পাত্রই সরিয়েছেন।"

মুখার্জি বললেন, "কিন্তু, কী করে সরালেন উনি ? চিঠিটা তো ছিল আমার ব্রিফকেসে।"

পুল্লা রেড্ডি একটু ভেবে বললেন "আপনার ব্রিফকেসটা কোন্ কোম্পানির ?"

মুখার্জি একটা কোম্পানির নাম বললেন।

রেড্ডি বললেন, "ব্র্যাণ্ডটা পপুলার বটে, কিন্তু তালা খুব সেফ নয়।"

"তা আর কী করে হবে। সরকারি কাজের ব্রিফকেস, সরকারি পয়সায় লোয়েস্ট টেণ্ডারে কেনা। শস্তার জিনিস।"

"তা ঠিক। আজকাল অনেক সরকারি অফিসেই এই ব্র্যাণ্ডের ব্রিফকেস কেনা হচ্ছে। দাম শস্তা বলে।"

"ঠিক বলেছেন। ইন ফ্যাক্ট, মিঃ পাত্রর ব্রিফকেসটাও একই মডেলের। রঙটাও এক।"

"তাই বুঝি ?" পুল্লা রেড্ডি প্রশ্নটা করে মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে। সাধারণত যখন গভীরভাবে চিন্তা করেন কিছু, তখনই এভাবে চেয়ে থাকেন তিনি।

কয়েক মিনিট এভাবে চেয়ে থেকে উনি হঠাৎ মুখার্জির দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিঃ পাত্রর বাড়ির ঠিকানা জানেন ?"

"জানি বইকী। একবার গিয়েওছিলাম ওঁর বাসায়।"

"তাহলে চলুন, ওঁর বাসায় যাই।"

মেজকা বাধা দিয়ে বললেন, "রেড্ডি, মিষ্টি আনতে দিয়েছে যে—"

"রাখো তোমার মিষ্টি। প্রতিটি মুহূর্তই এখন দামি। যতক্ষণ চিঠিটা মিঃ পাত্রর হাতে থাকে, ততক্ষণই ওটা উদ্ধারের আশা করা যায়।"

মুখার্জি বললেন, "আর পাত্র যদি চিঠিটা অলরেডি দিয়ে থাকেন শত্রুপক্ষকে ?"

"তাহলে অবশ্য ব্যাডলাক। কিন্তু আগে থাকতেই খারাপটা ভাবছেন কেন ? নাও দিয়ে থাকতে পারেন উনি। তবে চলুন ওঁর কাছে এক্ষুনি।"

এর পরের ব্যাপারগুলো খুব চটপট ঘটে গেল। আমরা সবাই মিঃ মুখার্জির অ্যামবাস্যাডারে চেপে রওনা হলাম মিঃ পাত্রর বাড়ির উদ্দেশে। সবারই বেশ উত্তেজিত অবস্থা। রেড্ডি শুধু মিঃ মুখার্জিকে বললেন, "স্যার, মিঃ পাত্রর সঙ্গে কথাটা আমিই বলব। এ ব্যাপারে আমাকে একটু স্বাধীনতা নিতে হবে।"

কলিংবেল বাজাতে মিঃ পাত্রই খুলে দিলেন দরজাটা। আমাদের দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন মনে হল। মুখার্জির দিকে চেয়ে বললেন, "কী ব্যাপার ? এঁরা কারা ?"

রেড্ডি এগিয়ে এসে বললেন, "আমরা চিঠিখানা ফেরত নিতে এসেছি মিঃ পাত্র।"

"চিঠি ? কোন্ চিঠি ?"

"ব্রাউন রঙের সিল-করা খামে ভরা চিঠি। যে চিঠিটা আপনি শনিবার দিন প্লেনে মিঃ মুখার্জির ব্রিফকেস থেকে চুরি করেছেন।"

"কী যা-তা বলছেন আপনি ?" রাগী মুখ করে মিঃ পাত্র মিঃ মুখার্জিকে বললেন, "মুখার্জি, ইনি কে ?"

"আমার পরিচয়টা নিজেই দিচ্ছি," —বলে পুল্লা রেড্ডি মিঃ পাত্রর দিকে এগিয়ে এলেন একটু। "আমি পি· রেড্ডি। সি· বি· আইয়ের ইনভেসটিগেটিং অফিসার।"

আমি আর মেজকা চোখাচোখি করলাম একবার।

'সি. বি. আই.' কথাটা শুনেই মিঃ পাত্রর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বললেন, "মিঃ রেড্ডি, আপনি ভুল করছেন "

"ভুল আমি করিনি।" পুল্লা রেড্ডি এগিয়ে এসে মিঃ পাত্রর কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, "আমার ওপর অথরিটি দেওয়া আছে আপনাকে অ্যারেস্ট করবার। তবে চিঠিখানা ফেরত পেলে তা করব না। এখন আপনিই ঠিক করুন কী করবেন।"

মিঃ পাত্র ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করছিলেন। আমি আর মেজকা প্রায় শ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে ছিলাম ওঁর দিকে। যদি মিঃ পাত্র সবকিছুই অস্বীকার করেন ? কতক্ষণ ব্লাফ দেবেন পুল্লা রেড্ডি ?

কয়েক মিনিট শ্বাসরোধকারী নীরবতার পর শব্দ করে শ্বাস ফেলে মুখ তুললেন মিঃ পাত্র। তারপর বললেন, "হাতটা সরান, চিঠি এনে দিচ্ছি।"

"উহুঁ, বাড়ির কাউকে বলুন চিঠি আনতে।"

মিঃ পাত্র ওঁর স্ত্রীকে ডেকে নিচু গলায় কিছু বললেন। ভদ্রমহিলা ভেতরে গেলেন ও একটু পরেই ফিরে এলেন। ওঁর হাতে ব্রাউন রঙের একখানা সিল-করা খাম।

পুল্লা রেড্ডি খামটা নিয়ে মিঃ মুখার্জির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখুন তো, এটাই কি-না—"

জবরদস্ত অফিসার মিঃ মুখার্জি ছোটখাটো একটা লাফ দিয়ে এমনভাবে চিঠিখানার ওপর হামলে পড়লেন যেন সাত রাজার ধন পেয়েছেন। বললেন, "হ্যাঁ, এটাই। থ্যাংক্স্, রেড্ডি, থ্যাংক্স্।" তারপর পাত্রর দিকে ফিরে বললেন, "বাইরে নিরীহ সরকারি অফিসার সেজে তলে-তলে এই কাণ্ড ? কতদিন ধরে এসব চালাচ্ছেন ?"

মিঃ পাত্র কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, "বিশ্বাস করুন, জীবনে এই প্রথম। মানে, পি. এ.-র ঘরে আপনার হাতে চিঠিখানা দেখে হঠাৎ আইডিয়াটা মাথায় জাগল। কী যে দুর্বুদ্ধি হল, ভাবলাম চিঠিখানা সরালে ইন্টারেস্টেড পার্টির কাছে বিক্রি করতে পারব মোটা টাকায়। চিঠিখানা যে জরুরি ও গোপনীয়, সেটা অবশ্য বুঝতেই পেরেছিলাম।"

মুখার্জি বললেন, "আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।"

রেড্ডি বললেন, "না, মিঃ পাত্রর কথা ঠিক বলেই মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা প্রিপ্ল্যান্ড্ হলে চিঠিখানা এতক্ষণ মিঃ পাত্রর কাছে থাকত না। শত্রুপক্ষের হাতে চলে যেত। মিঃ পাত্র বোধহয় দেখতে চাইছিলেন চিঠি হারানোর কী রি-অ্যাকশন হয় সরকারি মহলে, এবং কাদের কাছেই বা এটা বিক্রি করা যায়। কেমন, ঠিক বলেছি, তাই না ?"

বেচারা মিঃ পাত্র ঘাড় নাড়লেন শুধু।

মেজকা বললেন, "কিন্তু চিঠিখানা সরালেন কীভাবে সেটা বুঝতে পারছি না।"

"আন্দাজ করতে পারি সেটা," পুল্লা রেড্ডি মিঃ পাত্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভুল বললে শুধরে দেবেন। আপনার সুযোগটা আসে দু-জনার ব্রিফকেসই এক মডেলের হওয়াতে। এই মডেলের তালা ভাল নয়, তাই চেষ্টা করলে একটার চাবি দিয়ে অন্যটা খোলা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। মিঃ মুখার্জি জানালার ধারের সিটে বসেছিলেন, পায়ের কাছে ব্রিফকেস, আর এধারের সিটে মিঃ পাত্র, ওঁর ব্রিফকেসও তাঁর পায়ের কাছে। মিঃ মুখার্জি যখন বাথরুমে যাবার জন্য ওঠেন, তখন দুটো ব্রিফকেসই সরাতে হয়। ও দুটো রাখার সময় মিঃ পাত্র ইচ্ছে করেই অদল-বদল করেন ব্রিফকেস দুটো। এবং মিঃ মুখার্জি বাথরুমে থাকাকালীন নিজের চাবি দিয়ে মিঃ মুখার্জির ব্রিফকেস খোলেন। দেখতেও দুটো ব্রিফকেসই এক রকম। তাই এয়ার হস্টেস বা অন্য কোনো প্যাসেঞ্জারের নজরে এলেও কেউ কিছু ভাববে না। ব্রিফকেসটা সহজেই খুলে যায়। একটু ঘেঁটেই চিঠিটা বার করে নেন মিঃ পাত্র, এবং সেটা নিজের কোটের পকেটে রেখে ব্রিফকেসটা নিজের পায়ের কাছেই রাখেন। ততক্ষণে মিঃ মুখার্জি ফিরেছেন। ওঁকে সিটে যেতে দেবার জন্য দুটো ব্রিফকেসই তুলে ধরেন মিঃ পাত্র, এবং রাখার সময় ফের অদল-বদল করেন ব্রিফকেস—অর্থাৎ মিঃ মুখার্জির ব্রিফকেসটা মিঃ মুখার্জির পায়ের কাছেই রাখেন। কেমন, ঠিক বলেছি তো ?"

"হুবহু," নিশ্বাস ফেলে বললেন মিঃ পাত্র। "কী করে

জানলেন জানি না। অবশ্য আপনাদের, সি· বি· আই· ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারই আলাদা।"

তারপর মিঃ পাত্র মিঃ মুখার্জির হাত চেপে ধরে বললেন, "ভাই, এবারটির মতো মাপ করে দিন। জানেন তো, সি· বি· আই· ছুঁলে আঠারো ঘা। চাকরি যাবে, ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বসব।"

মিঃ মুখার্জি রেড্ডির দিকে চেয়ে চোখের একটু ইশারা করে বললেন, "আপনি কী বলেন মিঃ রেড্ডি ?"

পুল্লা রেড্ডি একটু চিন্তা করার ভান করে বললেন, "জিনিসটা যখন পাওয়া গেছে, এবং এটা যখন ফার্স্ট অফেন্স, তখন না-হয় ছেড়েই দেওয়া যাক।"

মিঃ পাত্র তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "শুধু ফার্স্ট নয়, লাস্টও বটে। জীবনে আর এমন দুর্মতি হবে না।"

আমরা তারপর মিঃ মুখার্জির বাড়ি এলাম। উনি স্ত্রীকে ডেকে চিঠিটা দিলেন আলমারিতে তুলে রাখার জন্য। তারপর পুল্লা রেড্ডিকে বললেন, "আপনার ঋণ যে কী করে শোধ করব "

পুল্লা রেড্ডি নিপাট ভালমানুষের মতো মুখ করে বললেন, "ঋণের কথা ওঠে কী করে স্যার, এটা তো আমাদের ডিউটি !"

মেজকা বললেন, "আমরা তা হলে যাই এখন ?"

মুখার্জি বললেন, "উহুঁ, সেটি হবে না। মিষ্টি খেয়ে যেতে হবে। না, মাথা নাড়া চলবে না। দিস ইজ অ্যান অর্ডার। বলুন কী খাবেন।"

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

টিনটিন

বিকেল ২·৫২
বিকেল ৩·০৩
!
হ্যাল্লো···হ্যাল্লো··· ধুত···কিছু শুনতে পাচ্ছি না !
বিকেল ৩·৪৮
হ্যাঁ, হ্যাডক। লোকটার দাড়ি আছে। ···কী, গাড়ি ? ···না না, দাড়ি। যা গালে থাকে !
বিকেল ৪·৩৫
জোহোদ
বুঝেছি। টিনটিন আর হ্যাডক। উঃ, কী ফোন রে বাবা ! ··হ্যাঁ, এক্ষুনি এয়ারপোর্টকে জানাচ্ছি।
জোহোদ
YZHÔL - DOUANE - CUS
এয়ারপোর্ট-পুলিশ কথা বলছি···হ্যাঁ সার্, বলুন·· হ্যাঁ, প্লেন এসেছে, নজর রাখছি।
AMAIH
যাক, কেউ কিছু জানে না !
থামুন !
?
!
আপনারা হ্যাডক আর টিনটিন ? আমাদের অফিসার আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন।
কে আপনার অফিসার ?
ক্যাপ্টেন, সেই স্টিকারটা !
মিনিট কয়েক বাদে···
আসুন, আসুন, চন্দ্রাভিযানের নায়কদের দেখে বর্ডুরিয়ার পুলিশ ধন্য।
মিঃ টিনটিন, আমাদের আনন্দের শেষ নেই।
আমরাও আনন্দিত
আমরা বর্ডুরিয়ার লোকরা আপনাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি।
আরে, এটা কী ?

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে অনেকরকম বাগান করেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে তিনি উধাও। এখানকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। দিপু তার দিদিকে কিছু না জানিয়ে মাঝরাতে বাইরে বেরিয়ে পুকুরধারে একজন রহস্যময় মানুষের দেখা পেল। তারপর দিপুও আর ঘরে ফিরে এল না। সকালবেলা ইরানি তার ভাইকে খুঁজে না পেয়ে গেল কাছাকাছি থানায় খবর দিতে। তারপর সবাই মিলে গেল শ্মশানঘাটে এক সাধুবাবার কাছে। এদিকে দিপুর ঘুম ভাঙল এক রহস্যময় জায়গায়। তারপর···

দিপু যেন আকাশ থেকে আস্তে আস্তে নীচে নামছে। ঠিক প্লেন থেকে প্যারাশুটে নামার মতন, যদিও দিপুর মাথায় প্যারাশুটের ছাতা নেই। দিপুর ঠিক পায়ের তলাতেই নদী। যদিও নদীতে বেশি জল নেই, তবু সে নদীতেই পড়বে। দিপু একটু-একটু বুঝতে পারছে এ-সবই সে স্বপ্নে দেখছে, এখন তার কোনও বিপদ হবে না।

কিন্তু নদীর খুব কাছাকাছি এসে দিপুর শরীরটা দুলতে লাগল। যেন সুতো দিয়ে ঘুড়ি টানার মতন কেউ তাকে অন্যদিকে টানছে। জলের ওপর থেকে সরে গিয়ে দিপু চলে এল পাড়ের দিকে। তারপর তার শরীরটা একটা গাছে আটকে গেল।

সেই গাছের ডাল ভাল করে ধরবার আগেই দিপু ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। এবারে বেশ জোরে। তার পায়ে ব্যথা লাগল, সে উফ্ করে শব্দ করল।

ডমরুজি তো ঠিকই বলেছিলেন, স্বপ্নেও ব্যথা লাগে।

দিপুর উফ্ শুনে নদীর ধারে পা-ঝুলিয়ে বসে থাকা জ্যাঠামশাই মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। তারপর একগাল হেসে বললেন, "এই দিপু, এদিকে আয়, তাড়াতাড়ি আয়, জলের মধ্যে তাকিয়ে দ্যাখ !"

জ্যাঠামশাই দিপুকে দেখে একটুও অবাক হলেন না ! এমন ভাবে কথা বললেন, যেন দিপুর সঙ্গে তাঁর খানিকটা আগেও দেখা হয়েছে।

দিপু জ্যাঠামশাইয়ের কাছে চলে আসতেই তিনি বললেন, "দ্যাখ, দ্যাখ, কী সুন্দর !"

দিপু নদীর জলের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না।

জ্যাঠামশাই বললেন, "ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখ। দু'রকম রং দেখতে পাচ্ছিস না ? আমরা সব সময় এক-এক জায়গার জলে শুধু একরকম রং দেখি, তাই না ? এখানে দ্যাখ নদীর জলে দুরকম রং।"

দিপু প্রথমে ভাবল জলের আবার রং কী ? সমুদ্রের জল নীল রঙের দেখায় বটে, কিন্তু বাকি সব জল তো শুধু জল-রং !

সে বলল, "জ্যাঠামশাই, আমি তো কোনও রং দেখতে পাচ্ছি না ?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "পাচ্ছিস না ? ও, তুই একেবারে নতুন এসেছিস তো, তোর চোখ এখনও ঠিক খোলেনি। হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওপরে হাল্কা সবুজ-সবুজ জল, তার নীচে একেবারে গাঢ় হলুদ। ওই যে একটু দূরে একটা বক বসে আছে, ওটার রং তুই কী দেখছিস ?"

দিপু বলল, "সাদা !"

জ্যাঠামশাই বললেন, "এঃ হে, তোর তো চোখ তাহলে একেবারেই খোলেনি। সাদা রঙের মধ্যে সাতটা রং লুকিয়ে থাকে জানিস তো ?"

দিপু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "সাদা রঙের মধ্যে না, কালো রঙের মধ্যে ?"

জ্যাঠামশাই সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, "আমি ওই বকটার গায়ে পরিষ্কার সাতটা রং দেখতে পাচ্ছি। ঠিক রামধনুর মতন। বকটা একটা রামধনু-রঙের জামা পরে আছে। এটাই তো এখানে আসার মজা !"

এবারে দিপু একটু ভয় পেয়ে গেল। জ্যাঠামশাই এসব কী কথা বলছেন ? উনি পাগল হয়ে যাননি তো ?

এই সময় আর একটি লোক নদীর ঘাটের দিকে নেমে এল। দিপু তাকিয়ে দেখল সে লোকটা ডমরুজি নয়। একজন অচেনা মানুষ। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, খালি গা, বুকে পৈতে।

লোকটি দিপুর কাছ ঘেঁষে চলে গেল, দিপুকে দেখতে পেল না। সে জ্যাঠামশাইয়ের দিকেও তাকাল না। জলে নেমে পা ধুতে লাগল।

জ্যাঠামশাই বললেন, "লোকটা জল ভাঙছে, দেখছিস ? কাচ যেমন ভাঙে, সেরকম জলও ভাঙে। দ্যাখ কী রকম গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।"

দিপু সেদিকে নজর দিল না, সে অবাক ভাবে চেয়ে রইল পৈতে-পরা লোকটির দিকে। জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনেও লোকটি ফিরে তাকাল না ? ও কি জ্যাঠামশাইয়ের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না ?

জ্যাঠামশাই বললেন, "তুই আমায় পাগল ভাবছিস তো ? প্রথম-প্রথম ও-রকম হয়। আমি নিজেকেই পাগল ভেবে সন্দেহ করেছিলুম। এখন সব বুঝেছি। তুই যা ভাবছিস ঠিক তাই। ওই লোকটা আমাদের দেখতেও পাচ্ছে না, আমাদের কথা শুনতেও পাচ্ছে না। আমরা তো স্বপ্নের মধ্যে এখানে এসেছি, কিন্তু ও-লোকটা সত্যি সত্যি এসেছে। স্বপ্ন আর বাস্তব পাশাপাশি, বুঝলি ?"

দিপু চুপ করে রইল। সে বুঝতে পারছে না।

আবার সে চমকে উঠল। কোথা থেকে হঠাৎ এসে উদয় হলেন সেই মানুষটি, সেই গোলগাল চেহারা, চকচকে টাক-মাথা। ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। শুধু তাই নয়, ইনি দাঁড়িয়ে

আছেন জলের ওপর।

ডমরুজি বললেন, "এই দ্যাখো দিপু, তোমার জ্যাঠামশাই ফিরতে চাইছেন না।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "না, না, না, না, ফেরার কথাই ওঠে না। দিপু বুঝি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে?"

দিপু বলল, "বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অনেকদিন আপনার কোনও খবর পাননি!"

জ্যাঠামশাই বললেন, "ওই তো মুশকিল। এখান থেকে কিছুতেই খবর পাঠানো যায় না। এই যে লোকটা জলে পা ধুচ্ছে, তুই ওর সামনে গিয়ে হাজার গলা ফাটিয়ে চিৎকার কর, তবু ও তোর কথা শুনতে পারবে না। এখান থেকে চিঠিও লেখা যায় না। তোর বাবা ক'দিন একটু চিন্তা করবে, তারপর ঠিক হয়ে যাবে। মরে যাওয়ার চেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া অনেক ভাল, তাই না? ভাববে কোনও একদিন ফিরে এলেও আসতে পারি।"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "এখন ফিরে যাবেন না কেন? এটা কোন্ জায়গা?"

জ্যাঠামশাই আর ডমরুজি দু'জনেই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলেন।

জ্যাঠামশাই বললেন, "এটা কোনও জায়গাই নয়। আমরা তো কোনও জায়গায় থাকি না। আমরা একটা স্বপ্ন থেকে আর একটা স্বপ্নতে চলে যাই।"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "আমরা কতক্ষণ স্বপ্ন দেখব? জাগব না? আমাদের খিদে-টিদে পাবে না?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "ওসব কিছু চিন্তা নেই রে এখানে। স্বর্গ কাকে বলে জানিস তো? আকাশের ওপারে যে স্বর্গ? সেখানে কোনওদিন যাব কি না জানি না, কিন্তু এই যে স্বপ্নের জগতে চলে এসেছি, এখানকার সুখ স্বর্গের চেয়ে কিছু কম নয়। সবই এই দীনবন্ধুর দয়াতে হয়েছে।"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "দীনবন্ধু কে?"

ডমরুজি বললেন, "ওটাও আমারই নাম। শোনো, দিপু, তোমার জ্যাঠামশাই খুব খুশি মনে এখানে আছেন বটে, কিন্তু আমি মোটেই এই অবস্থায় থাকতে চাই না। আমি ফিরে যেতে চাই। মুশকিল এই, আমি মাঝখানে আটকে গেছি, কিছুতেই ফিরতে পারছি না। মহাভারতে অভিমন্যুর কাহিনী মনে আছে তোমার? অভিমন্যু যেমন চক্রব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর বেরুতে পারেননি, আমারও হয়েছে সেই দশা।"

জ্যাঠামশাই হাসতে হাসতে বললেন, "বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে। ভাগ্যিস আপনার এরকম হয়েছিল, তাই আমরাও এরকম মজা করতে পারছি!"

ডমরুজি বললেন, "দিপু, তোমার জ্যাঠামশাইয়ের কিন্তু সে-অবস্থা নয়। অর্থাৎ আমার মতন নয়। উনি ইচ্ছে করলে ফিরতে পারেন। কিন্তু উনি যে ফিরতে চাইছেনই না। বেশিদিন থাকলে শেষ পর্যন্ত ফেরার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "যাক বন্ধ হয়ে। ফিরে গিয়ে কে আবার টাকাপয়সার হিসেব, চালডালের হিসেব আর পেয়ারালেবুর হিসেব করতে চায়?"

হঠাৎ আকাশটা কালো হয়ে মেঘের গুরুগুরু শোনা গেল।

ডমরুজি বললেন, "আমার এখানে সময় হয়ে গেছে। এই

এক জ্বালা। সর্বক্ষণ দৌড়োদৌড়ি। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে, না আমবাগানে ফিরবে ?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "আপনার সঙ্গে যাব ! আপনার সঙ্গে..."

ডমরুজি নিচু হয়ে খানিকটা জল তুলে ছিটিয়ে দিলেন ওদের দু'জনের গায়ে। সঙ্গে-সঙ্গে দিপুর চোখ বুজে এল, সে বুঝতে পারল আবার সে দুলতে-দুলতে কোথাও চলে যাচ্ছে। সত্যি-সত্যি যাচ্ছে না, স্বপ্নের মধ্যে। এক স্বপ্ন থেকে আরেক স্বপ্নের দিকে যাত্রা।

একটু পরেই আবার আপনা-আপনি দিপুর চোখ খুলে গেল। এবারে সে দেখতে পেল একটা রাস্তা। দু'পাশে পরপর বাড়ি। কোনও বাড়ির নীচে দোকানঘর। রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে, সাইকেল-রিকশা, মোষের গাড়ি, অনেক রকম শব্দ। কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে, এটা স্বপ্ন। ঠিক মনে হচ্ছে যেন কোনও ছোটখাটো শহরের রাস্তায় সে দাঁড়িয়ে আছে।

দিপু কাছাকাছি কোথাও জ্যাঠামশাইকে দেখতে পেল না। ডমরুজিকেও না। এখানে সে একা-একা এল কেন ? এরপর সে কী করবে ?

রাস্তার কোনও লোক তার দিকে তাকাচ্ছে না। দিপু তাহলে অদৃশ্য মানুষ ? সে 'দা ইনভিজিব্‌ল ম্যান' নামে একটা বই পড়েছিল, যাতে একজন বৈজ্ঞানিক অদৃশ্য হবার উপায় শিখে গিয়েছিলেন। তাঁর শরীরটা কাচের মতন হয়ে গিয়েছিল। সারা গায়ে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে তিনি একটা হোটেলে না গেস্ট হাউসে উঠেছিলেন। সেই লোকটির জীবন তো খুব দুঃখের !

তারপর দিপু বুঝতে পারল, সে শুধু সিনেমার মতন এই রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে। সে নিজে এখানে নেই। সে শুয়ে আছে অন্য কোথাও। রাস্তার মাঝখান দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে, অথচ তার গায়ে লাগছে না, এ কখনও হয় ?

এবারে তার পাশেই ডমরুজিকে আবার হাজির হতে দেখে দিপু একটুও অবাক হল না।

দিপু জিজ্ঞেস করল, "জ্যাঠামশাই কোথায় ?"

ডমরুজি বললেন, "তিনি তো অন্য স্বপ্নতে চলে গেলেন। তোমরা দু'জনে তো একসঙ্গে একটা স্বপ্ন দেখোনি ?"

"জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আর দেখা হবে না ?"

"হতে পারে। আবার দু'জনে কিছুক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় আসতে পারো।"

"আমায় জাগিয়ে দিন।"

"হ্যাঁ, সেই কথাটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তোমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে তো কথা বলে দেখলে। উনি গোঁয়ার্তুমি করছেন, যেতে চাইছেন না। তুমি ফিরে যাবে ? তাহলে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"আমি একা ফিরে যাব ?"

"হ্যাঁ। তাছাড়া আর উপায় কী !"

দিপু মাথা নেড়ে বলল, "না, জ্যাঠামশাইকে খোঁজার জন্যই তো এসেছি। ওঁকে না নিয়ে আমি কিছুতেই ফিরে যাব না।"

ডমরুজি ব্যস্তভাবে বললেন, "উহুঃ, উহুঃ, অত জোর দিয়ে না-ফেরার কথা বলতে নেই। তাতে বিপদ হতে পারে।"

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

শিশুরঙ্গনের নতুন নাটক
খুদে যাযাবর ইসতাসি

নিশ্চয়ই শিশুরঙ্গনের নাম তোমাদের কাছে আজ আর অজানা নয়। ছোটদের আনন্দ-রাজ্যে কত যে চমৎকার নাটক শিশুরঙ্গনের খুদে অভিনেতারা উপহার দিয়েছে, তা-ও গুনে শেষ করা যায় না। এই সেদিন এদের আর-একটি নতুন আর চমকদার নাটক দেখে এলুম ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল্-এ। নাটকটির নাম 'খুদে যাযাবর ইসতাসি'। এই নামেই শৈলেন ঘোষের একটি উপন্যাস বেরিয়েছিল ক'বছর আগে আনন্দমেলার পুজো-সংখ্যায়। সেই গল্পেরই এই নাটক। ইসতাসি নামে ছোট্ট এক যাযাবর ছেলের সঙ্গে কেমন করে এক দেশের এক রাজার ছেলের বন্ধুত্ব হল, কেমন করে ইসতাসি সেই রাজার প্রতিহিংসার কবল থেকে পালিয়ে এক দুর্গম অরণ্যে লুকিয়ে পড়েছিল, শেষমেশ সেখানে ভয়ংকর বিপদের মধ্যেও সে কেমন করে খুঁজে পেয়েছিল আর-এক নতুন বন্ধু বনের ভাল্লুককে, তারই এক গা-শিউরে-ওঠা গল্পে-জমাট এই নাটক। আমরা দেখেছি, এই নাটকটি দেখতে-দখতে ছোট্ট দর্শকরা কখনও উত্তেজনায় টান-টান হয়ে বসছে, কখনও দেখেছি, ইসতাসির দুঃখে তাদেরও মুখগুলি ভার হয়ে উঠেছে, আবার দেখেছি, আনন্দে ভেসে উঠেছে যখন মঞ্চ, তখন হাততালিতে ভরে গেছে সারা প্রেক্ষাগৃহ। নাটকে ইসতাসির চরিত্রে ইন্দ্রনীল দত্তের যেমন অভিনয়, তেমনি রাজপুত্র অর্ণব ধর, রাজা মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আনাতি দীপক ভড়, হীরক কয়াল, মঞ্জরী চট্টোপাধ্যায়, নিতাই মিত্র আর সত্যনারায়ণ দত্ত। এই নাটকে আর-একটি একেবারে আনকোরা নতুন জিনিস দেখা গেল, নাটকের মধ্যে-মধ্যে পুতুল-নাচের দৃশ্য। এমন দৃশ্য প্রচুর বাহবা কুড়িয়েছে। যেমন গান, তেমনি আলোর জাদু, জলপ্রপাত, তেমনি অবাক-করা ভাল্লুকের পোশাক। শেষে বলি, যখনই সুযোগ পাবে 'খুদে যাযাবর ইসতাসি' দেখতে যেন ভুল না হয়।

ফোটো : সুবীর চট্টোপাধ্যায়

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : মাথায় কবিতা আসছে না বলে হরিবাবুর মন খারাপ। বাগানে ঘুরতে-ঘুরতে তিনি একটা উটকো লোককে দেখতে পান। ভেবেছিলেন চোর-ছ্যাঁচোড়, কিন্তু লোকটা জানায় হরিবাবুর স্বর্গত পিতা শিবু হালদার তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। হরিবাবুকে একটা চাবি দিয়ে সে বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।" লোকটা নাকি স্বর্গত শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে ঘুমোত। একদিন মাঝরাত্তিরে জেগে দেখতে পায়, আলপিনের মতো ছোট্ট পিস্তল দিয়ে শিবুবাবু তিন-তিনটে কালা-সাহেবকে খতম করলেন, তারপর বাগানের মধ্যে পুঁতে ফেলা হল তাদের লাশ। শুনে, হরিবাবু তো অবাক। তারপর ...

হরিবাবু লোকটাকে বিশ্বাস করছেন না ঠিকই, কিন্তু কথাগুলো একেবারে উড়িয়েও দিতে পারছেন না। কেয়াঝোপটার দিকে তাকিয়ে একটু দুর্বল গলায় বললেন, "গুল মারার আর জায়গা পাওনি ? আমার বাবাকে খুনি বলে বদনাম দিতে চাও ?"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলে, "আজ্ঞে আত্মরক্ষার জন্য খুন করলে সেটাকে খুন বলে ধরা হয় না। আইনেই আছে। শিবুবাবু তো নিজেকে বাঁচাতে খুন তিনটে করেছিলেন। এখনও ওই কেয়াঝোপের এলাকার মাটি খুঁড়লে তিনটে কঙ্কাল পাওয়া যাবে। শাবল-টাবল নেই বাড়িতে ? দিন না, খুঁড়ে দেখাচ্ছি।"

হরিবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "থাক্ থাক্, তার দরকার নেই।"

পঞ্চানন্দ তার খড়িওঠা গা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "একটু চান-টান করা দরকার, বুঝলেন ! খাঁটি সর্ষের তেল ছাড়া আমার আবার সহ্য হয় না। এক টুকরো গন্ধসাবান কি পাওয়া যাবে ?"

রাগে হরিবাবু ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিলেন। চোখ দিয়ে লোকটাকে প্রায় ভস্ম করে দিতে দিতে বললেন, "আর কী কী চাই তোমার বাপু ?"

পঞ্চানন্দ মাথা চুলকে বলল, "আরও কিছু চাই বটে, কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না। তা ক্রমে ক্রমে বলব'খন। এখন একটু তেল আর সাবান হলেই হয়। আমার গরম জল লাগে না, গামছারও দরকার নেই আর ফুলেল তেল না হলেও চলবে।"

"বটে !"

লোকটা গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, "দাড়িটা বড্ড কুটকুট করছে তখন থেকে। আট গণ্ডা পয়সা পেলে সেলুনে গিয়ে কামিয়ে আসতাম। আর মাথার অবস্থাটাও দেখুন, চুল একেবারে কাকের বাসা। তা ধরুন আরও পাঁচসিকে হলে চুলটারও একটা গতি হয়।"

"ব্ল্যাকমেল করার ফিকিরে আছ তো ? দেখাচ্ছি ব্ল্যাকমেল !"

"মেল ? আজ্ঞে মেলট্রেনের কথা উঠছে কেন বলুন তো ? আমার তো এখন কোথাও যাওয়ার কথা নেই ? তবে ফিকিরের কথা যদি বলেন তো বলতে হয়, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি খুব ফিকিরের লোক। শিবুবাবু যখন আকাশী জামা বানালেন, তখন সেই জামা পরে আমিও তাঁর সঙ্গে আকাশে উঠে যেতুম। হেঃ হেঃ ! খুব মজা হত মশাই। দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ানো। মেঘের রাজ্যে ঢুকে সে যে কী রগড়ই হত ! তা তখন একদিন একটা ফিকির খেলল মাথায়। একদিন দুধ চিনি সব সঙ্গে নিয়ে গিয়ে খানিকটা মেঘ মিশিয়ে দিব্যি আইসক্রিম বানিয়ে খেলুম দুজনায়। শিবুবাবুও বলতেন, পঞ্চানন্দ, তুই খুব ফিকিরের লোক।"

"আকাশী জামা ?" হরিবাবুর চোখ একদম রসগোল্লার মতো গোল হয়ে গেল।

"তবে আর বলছি কী ? শিবুবাবু পাগলা গোছের ছিলেন বটে, তবে বুদ্ধির একেবারে ঢেঁকি। ফটাফট আজগুবি সব জিনিস বানিয়ে ফেলতেন।"

"কই, আমি তো এইসব আবিষ্কারের কথা শুনিনি ?"

"খুব গোপন রেখেছিলেন কিনা। সর্বদাই শত্রুপক্ষের চরেরা ঘুরঘুর করত যে। ওই তিনটে সাহেব খুন হল কি এমনি-এমনি ? তারাও মতলব নিয়েই এসেছিল। আরও সব আসত। মিশমিশে কালো লোক, চ্যাপটা নাক আর ছোট চোখ-অলা লোক, বাদামি রঙের ঢ্যাঙা চেহারার লোক, বেঁটে বক্কেশ্বর চেহারার লোক। তারা বড় ভাল লোকও ছিল না। একদল তো চিঠি দিয়েছিল, যদি আকাশী জামার গুপ্ত কথা আমাদের না জানান, তো আপনার ছেলে হরিকে চুরি করব।"

"বলো কী ?"

"আজ্ঞে একেবারে নিয্যস সত্যি। চুরি করে নিয়ে মেরেই ফেলত বোধহয়। সেই ভয়ে শিবুবাবু শেষ দিকটায় সব লুকিয়ে-টুকিয়ে ফেললেন, জিনিসও আর তেমন বানাতেন না। তবু ওলন্দাজের হাতে প্রাণটা দিতে হল।"

"তার মানে ? ওলন্দাজটা আবার কি ?"

"আচ্ছা মশাই, আপনার কি খিদে-তেষ্টা নেই নাকি ? আপনার না থাক, আমার আছে। যদি অসুবিধে থাকে তো বলুন, আমি নাহয় অন্য জায়গায় যাই। তখন থেকে বকে-বকে মুখে ফেকো উঠে গেল।"

হরিবাবু একটু নরম গলায় বললেন, "আচ্ছা বাপু বোসো, তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওই দিকে কলাঝাড়ের ওপাশে একটা কুয়ো আছে, চানটান করে নাও গে।"

খুবই চিন্তিতভাবে হরিবাবু ফিরে এলেন ঘরে। বাচ্চা চাকরটাকে ডেকে তেল দিয়ে আসতে বললেন। এক টুকরো সাবানও।

হরিবাবুর স্ত্রী এসে বললেন, "বলি লাটসাহেবটি কে ?"

"ইয়ে, বাবার বন্ধু।"

"শ্বশুরমশাইয়ের বন্ধু ওইটুকু একটা ছোঁড়া ! তোমার মাথাটা গেছে।"

"ঠিক বন্ধু নয়, ওই সাকরেদ ছিল আর কী।"

"তুমি ঠিক জানো, নাকি মুখের কথা শুনে বিশ্বাস করলে ?"

হরিবাবু বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন, "খুব চিনি। ছেলেবেলায় কতবার দেখেছি।"

মিথ্যে কথাটা বলে একটু খারাপও লাগছিল হরিবাবুর। তবে না বললেও চলে না। এ বাড়ির কেউ হরিবাবুর বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখে না। কিন্তু হরিবাবু জানেন, মাঝেমধ্যে একটু-আধটু গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেললেও তিনি বোকা লোক নন।

তাঁর স্ত্রী অবশ্য আর উচ্চবাচ্য করলেন না। আপনমনে হরিবাবুর নির্বুদ্ধিতার নানা উদাহরণ দিতে দিতে রান্নাঘরে চলে গেলেন। হরিবাবু রোদে বসে তেল মাখতে মাখতে হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে আকাশী জামার কথা ভাবতে লাগলেন। আকাশী জামা হাতে পেলে তাঁর ভারী উপকার হত। পৃথিবীর এইসব গণ্ডগোল এড়িয়ে দিব্যি মেঘের ওপরে গিয়ে বসে কবিতার পর কবিতা লিখে যেতেন।

ভাবতে ভাবতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, তেল-মাখা অবস্থাতেই বসে রইলেন। স্নান-খাওয়ার কথা আর মনেই রইল না। মেঘের বিছানায় বসে, মেঘের বালিশে ঠেস দিয়ে কবিতা লিখতে যে কী ভালই না লাগবে! মাঝে-মাঝে মেঘ থেকে আইসক্রিম বানিয়ে খেয়ে নেবেন। তবে তাঁর ভারী সর্দির ধাত, আইসক্রিম সহ্য হবে কি ?

কতক্ষণ এইভাবে বসে থাকতেন তা বলা শক্ত। হঠাৎ একটা জোরালো গলা-খাঁকারির শব্দে সচেতন হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, বেশ তেল-চুকচুকে চেহারা নিয়ে পঞ্চানন্দ দাঁড়িয়ে আছে। গাল-টাল কামানো, ফিটফাট। অমায়িক হেসে বলল, "আজ্ঞে, স্নানের পর খাওয়ারও একটা নিয়ম আছে। তা কবিদের বেলায় কি কোনো নিয়মই খাটে না ?"

"কেন, নিয়ম খাটবে না কেন ?"

"আপনারা সাধারণ মানুষ নন জানি, কিন্তু খিদে তো পাওয়ার কথা। আমাদের গাঁয়ে ভজহরি কবিয়ালকেও দেখেছি, ঝুড়িঝুড়ি কবিতা লিখে ফেলত লহমায়। তারও কাছাকোছার ঠিক থাকত না, এ-পথে যেতে ও-পথে চলে যেত, রামকে শ্যাম বলে ভুল করত, ঘোর অমাবস্যায় পূর্ণিমার পদ্য লিখে ফেলত, কিন্তু খিদে পেলে সে একেবারে বক-রাক্ষস। হালুম-খালুম বলে লেগে যেত খাওয়ায়। আপনি যে দেখছি তার চেয়েও ঢের এগিয়ে গেছেন।"

"অ ! হ্যাঁ, খাওয়ার একটা ব্যাপার আছে বটে। খিদেও পেয়েছে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না পেটে এ-রকম একটা খুটখাট হচ্ছে কেন।"

"কী রকম বলুন তো ! রাতের বেলায় ইঁদুর যেমন খুটখাট করে বেড়ায় সে-রকম তো ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকটা সে-রকম।"

"তা হলে বলতে নেই আপনার খিদেই পেয়েছে। এবার গা তুলে ফেলুন, নইলে গিন্নিমা আমাদের ব্যবস্থাও করবেন না কিনা। আমারও পেটে ইঁদুরের দৌড়োদৌড়ি লেগে গেছে।"

হরিবাবু খুবই অন্যমনস্কভাবে স্নান-খাওয়া সেরে নিলেন।

দুপুরবেলায় বিছানায় আধশোয়া হয়ে পিতলের চাবিটা খুব নিবিষ্টমনে দেখলেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। তাঁর সন্দেহ হতে লাগল, বাবা তাঁর আবিষ্কার-করা জিনিসগুলো কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছেন। ঈশান কোণে তিন ক্রোশ দূরে কোথাও। সেখানে এই পিতলের চাবি দিয়ে গুপ্ত দরজা খুলে ফেলতে পারলেই কেল্লা ফতে।

হরিবাবু যখন এইসব ভাবছেন তখন অন্যদিকে পঞ্চানন্দ দুপুরের খাওয়া সেরে বাড়ির চাকরের সঙ্গে গল্প জুড়েছে। চাকর কুয়োতলায় বাসন মাজছিল। পঞ্চানন্দ সেখানে গিয়ে ঘাসের ওপর জেঁকে বসে বলল, "ওফ্, কত পাল্টে গেছে সব।"

চাকরটা বলল, "তা আর বলতে ! আগে জলখাবারের জন্য পাঁচখানা রুটি বরাদ্দ ছিল, এখন চারখানা। আগে চিনির চা দিত, আজকাল গুড়ের। আর জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ বাড়লেও বেতন সেই পুরনো রেটে। ওটাই কেবল পাল্টায়নি।"

পঞ্চানন্দ কথাটা কানে না-তুলে বলল, "ত্রিশ বছর আগে যা দেখে গিয়েছিলুম তা আর কিছু নেই। তবে ভূত তিনটে নিশ্চয়ই আছে, না রে ?"

"ভূত ! তা থাকতে পারে।"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলে, "আহা, অত হালকা-ভাবে নিচ্ছিস কেন ? যে-কোনো ভূতের কথা বলছি না। এ হল তিনটে সাহেব-ভূত। তখন তো খুব দাপাদাপি করে বেড়াত।"

চাকর কাজ থামিয়ে হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, "সাহেব-ভূত ! এ-বাড়িতে ছিল নাকি ?"

"থাকবে না মানে ! যাবে কোথায় ? ওই কেয়াঝোপের নীচে মাটির তলায় তাদের লাশ চাপা আছে না ?"

"সত্যি বলছ ?"

"মিথ্যে বলার কি জো আছে রে ? নিজের হাতে পুঁতেছি তাদের। ওই পোঁতার পর থেকেই তাদের এখানে-সেখানে রাত-বিরেতে দেখা যায়। দেখিসনি ?"

"আমি মোটে দু'মাস হল এসেছি। এখনও দেখিনি।"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলে, "মাঝে-মাঝে দেখা যায় না বটে। বিশেষ করে এই সময়টায় ওরা নিজেদের দেশে বেড়াতে যায়। ফিরে এসেই আবার লাগাবে'খন কুরুক্ষেত্র।"

"তিনটে সাহেব খুন হল কী করে ?"

পঞ্চানন্দ গলা নামিয়ে বলল, "সে অনেক গোপন কথা।"

চাকরটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "সাহেব-ভূতের কথা জানি না, তবে এ-বাড়িতে একটা পাহাড়ি ভূত আছে। বেঁটেখাটো মজবুত চেহারা।"

"বলিস কী ?"

"কোমরে অ্যাই বড় ছোরা। দেখবে'খন, যদি থাকো। ওই যে বুড়োকর্তার জাদুইঘর, ওর দাওয়ায় রাত-বিরেতে বসে থাকে এসে।"

কথাটা শুনে পঞ্চানন্দ হঠাৎ যেন কেমন ফ্যাকাসে মেরে গেল। (ক্রমশ)

ওষ্ঠবক্র রহস্য

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : ইসা হুইটনি আফিমখোর। তার স্ত্রী ওয়াটসনের সাহায্য চায়। ওয়াটসন আপার সোয়ানডাম লেনে আফিমের আড্ডায় ঢুকে হুইটনির সন্ধান পায়। ওয়াটসনের গাড়ি নিয়ে হুইটনি বাড়ি ফেরে। কিন্তু সেই আড্ডাতেই ওয়াটসন দেখতে পায় ছদ্মবেশী শার্লক হোম্‌সকে। হোম্‌স এসেছে নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের খোঁজে। নেভিল এই আড্ডায় ঢুকেছিল। তারপরেই সে নিরুদ্দেশ। ওয়াটসনকে সঙ্গে নিয়ে হোম্‌স চলেছে সেন্ট ক্লেয়ারের বাড়িতে। তারপর···

॥ ২ ॥

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে হোম্‌স বললে, "ওয়াটসন, তোমার এই চুপ করে থাকবার ক্ষমতার সত্যি তুলনা হয় না। এই গুণের জন্যেই তুমি সঙ্গী হিসেবে অদ্বিতীয়। বিশ্বাস করো, এমন একজন সঙ্গীই আমার চাই, যার কাছে আমি আমার মনের সমস্ত কথা খুলে বলতে পারি। এই মুহূর্তে আমার মাথার মধ্যে যে চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটা আর যা-ই হোক খুব আনন্দের নয়।

"আমরা গিয়ে পৌঁছনো মাত্রই যে ভদ্রমহিলা আমাদের দরজা খুলে দিতে আসবেন তাঁকে যে কী বলব তা আমার মাথায় আসছে না।"

"লিয়ে পৌঁছবার আগেই তোমাকে ব্যাপারটার মোটামুটি একটা বিবরণ দিতে পারব বলে আশা করি। ব্যাপারটা এমনিতে খুবই সহজ বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, এমন কোনো সূত্র পাচ্ছি না যেটাকে ধরে এগোতে পারি। বলতে পারি যে এটা হচ্ছে একটা যেন জটপাকানো সুতো। অনেকগুলো মুখ আছে, কিন্তু মূলটা পাচ্ছি না। এখন আমি তোমাকে সব ব্যাপারটা বলছি। এমন হতে পারে যে, যদিও আমি অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, তুমি হয়তো কোনো আলোর ফুলকি দেখতে পাবে।"

"তাহলে বলো।"

"বেশ কয়েক বছর আগে, সঠিক তারিখটা হল মে, ১৮৮৪—লিয়েতে এক ভদ্রলোক বাস করতে আসেন। তাঁর নাম নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার। হাবভাব দেখে মনে হত তিনি একজন বেশ বড়লোক। তিনি একটা বড় হাতাওয়ালা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাস করতে লাগলেন। বেশ বড়লোকি চালেই তিনি থাকতেন। আস্তে-আস্তে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হতে লাগল। ১৮৮৭ সালে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর মেয়েকে তিনি বিয়ে করেন। ভদ্রলোক কোনো চাকরি করতেন না। তবে অনেক কোম্পানিতে তাঁর টাকা লগ্নি করা ছিল। সাধারণত তিনি সকালের ট্রেনে লণ্ডন যেতেন আর ফিরে আসতেন ক্যানন স্ট্রিট স্টেশন থেকে ৫টা ১৪ মিনিটের ট্রেন ধরে। মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের বয়স এখন সাঁইত্রিশ। শান্ত, সুবোধ ভদ্রলোক। দুটি সন্তান নিয়ে বেশ সুখে থাকতেন। আর পাড়া-পড়শিরা তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। আমি খোঁজখবর করে যতদূর জানতে পারি যে, বাজারে তাঁর দেনা হচ্ছে ৮৮ পাউণ্ড ১০ শিলিং। কিন্তু ক্যাপিটাল অ্যাণ্ড কাউন্টিজ ব্যাঙ্কে তাঁর জমা আছে ২২০ পাউণ্ড। সুতরাং একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, তাঁর মনে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না।

"গত সোমবার মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার অন্যদিনের চেয়ে একটু সকাল-সকালই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। যাবার আগে বলে যান যে, শহরে তাঁর দুটো জরুরি কাজ আছে, আর ফেরবার পথে তিনি তাঁর ছেলের জন্যে একবাক্স খেলনা কিনে আনবেন। এখন হয়েছে কী, সেইদিনই মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার বেরিয়ে যাবার পর তাঁর স্ত্রী লণ্ডন থেকে একটা টেলিগ্রাম পান। টেলিগ্রামটা এসেছিল অ্যাবারডিন শিপিং কোম্পানির অফিস থেকে। তাঁর বিদেশ থেকে একটা মূল্যবান জিনিস আসবার কথা ছিল। সেটা এসে গেছে। তোমার জানা আছে কি না জানি না, অ্যাবারডিন শিপিং কোম্পানির অফিস হচ্ছে ফ্রেসনো স্ট্রিটে। ফ্রেসনো স্ট্রিটটা আবার বেরিয়েছে আপার সোয়ানডাম লেন থেকে, যেখানে তোমার সঙ্গে আমার আজ রাত্রে দেখা হল। মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে লণ্ডনে যান। সেখান থেকে তাঁর জিনিসটি সংগ্রহ করে তিনি ঠিক চারটে-পঁয়ত্রিশ মিনিটে আপার সোয়ানডাম লেন ধরে হাঁটছিলেন স্টেশনে ফেরবার জন্যে। এতক্ষণ যা বললুম তুমি সব কথা বুঝেছ তো?"

"হ্যাঁ। সব বুঝেছি।"

"তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, গত সোমবার অত্যন্ত গরম পড়েছিল। মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার একটা গাড়ি ধরবেন বলে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে বেশ দুলকি চালে রাস্তা হাঁটছিলেন। সোয়ানডাম লেন ধরে হাঁটবার সময় হঠাৎ একটা চাপা আর্তনাদ তাঁর কানে আসে। সেই শব্দটা যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে কৌতূহলী হয়ে তাকাতেই তিনি একটা দোতলা বাড়ির জানলায় যে-দৃশ্য দেখলেন তাতে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দোতলার সেই জানলাটা সম্পূর্ণ খোলা ছিল। তিনি দেখলেন তাঁর স্বামী জানলা দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মনে হল তিনি যেন তাঁকে হাত নেড়ে ডাকলেন। আগেই বলেছি যে, জানলাটা একদম খোলা ছিল, তাই তাঁর দেখতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার তাঁর স্বামীর মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, সে সময়ে তাঁর স্বামীর চোখমুখ উত্তেজনায় থমথম করছিল। তাঁর স্বামী তাঁকে খুব উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে ইশারা করেন। কিন্তু তারপরেই মিসেস সেন্ট ক্লেয়ারের মনে হয় কেউ যেন খুব জোর করে পিছনদিকে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল। আর একটা জিনিস লক্ষ করে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার খুব আশ্চর্য হন। সেটা হল, যদিও তিনি যে কালো কোট পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সেটা তাঁর গায়ে ছিল বটে, কিন্তু তাঁর জামার কলার বা নেকটাই

প্রতিটি সুইট খাসা দারুণ মজায় ঠাসা!

বড় আকার!
খেতেও বড় মজাদার!

নিউট্রিন
SuperStar
সেরা টফি চমৎকার

nutrine ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর সুইট
নিউট্রিন কনফেকশানারী কোং প্রাঃ লিঃ, চিত্তুর, অ. প্র.

কোনোটাই ছিল না।

"তাঁর স্বামীর কোনো বিপদ হয়েছে বুঝে তিনি ওই বাড়ির দিকে ছুটলেন। কোন্ বাড়িটার কথা বলছি বুঝতে পারছ তো ? যেখানে আমার সঙ্গে তোমার আজ দেখা হল। বাড়ির দরজায় ওই পাজি ম্যানেজার দাঁড়িয়ে ছিল। সে আর তার সাকরেদ ডেনমার্কের গুণ্ডাটা তো তাঁকে দরজার গোড়ায় আটকে দিলে। তারপর তাঁকে প্রায় একরকম জোর করে সেখান থেকে সরিয়ে দিলে। রাগে, ভয়ে প্রায় পাগলের মতো হয়ে তিনি যখন রাস্তা দিয়ে দৌড়চ্ছিলেন তখন ফ্রেসনো স্ট্রিটে একজন সার্জেন্ট আর কয়েকজন কনস্টেবল আসছিল। তাঁর কথা শুনে সার্জেন্ট তার দলকে নিয়ে ওই আড্ডায় এসে হাজির হল। ওই আড্ডার মালিকের কোনো ওজর আপত্তি না শুনে যে ঘরে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার তাঁর স্বামীকে দেখেছিলেন, সার্জেন্ট সেই ঘরে গেল। সেখানে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না। সে ঘরে কেন, সেই গোটা দোতলায় মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সত্যি কথা বলতে কী, একটি অত্যন্ত কুৎসিতদর্শন এক বিকলাঙ্গ ছাড়া সেখানে দ্বিতীয় কোনো প্রাণীকে দেখতে পাওয়া গেল না। ম্যানেজার আর সেই বিকলাঙ্গ লোকটি দুজনেই খুব জোর গলায় শপথ করে বললে যে, সামনের ঘরে দুপুর থেকে কেউ আসেনি বা ছিল না। তাদের জোরালো আপত্তি শুনে সার্জেন্টও একটু দমে গেল। তার মনে সন্দেহ হতে লাগল যে, হয়তো মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার ভুল দেখেছেন। এমন সময় মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার চিৎকার করে ঘরের টেবিল থেকে একটা কাগজের মোড়া প্যাকেট তুলে নিলেন। কাগজের মোড়কটা খুলতে ছেলেদের খেলবার বিল্ডিং ব্লকের একটা বাক্স বেরিয়ে পড়ল। তোমার বোধহয় মনে আছে যে, সেইদিন মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার বাড়ি থেকে বেরুবার সময় তাঁর ছেলেকে ওইরকম একটা বিল্ডিং ব্লক কিনে দেবেন বলেছিলেন।

"এই জিনিসটা পাবার পরে সেই বিকলাঙ্গ লোকটা এমন এলোমেলো কথা বলতে লাগল যে সার্জেন্টের মনে হল ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো। দোতলার ঘরগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হল। বোঝা গেল খুব জঘন্য ধরনের একটা অপরাধ ঘটেছে। সামনের দিকের ঘরটা বেশ পরিপাটি করে সাজানো। দেখলেই বোঝা যায় যে, এটাকে বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এরপরে একটা ছোট শোবার ঘর। শোবার ঘরের পেছনে নদীর ঘাট। শোবার ঘরের জানলা আর নদীর ঘাটের মধ্যে একফালি জমি। জোয়ারের সময় অবশ্য সেটা জলের তলায় যায়। শোবার ঘরের জানলাটা খুব বড়। তলা দিয়ে ঠেলে খুলতে হয়। জানলার ফ্রেম খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, সেখানে রক্তের ছিটে লেগে আছে। শোবার ঘরের কাঠের মেঝেতেও ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত দেখা গেল। তারপর আরও খুঁটিয়ে তল্লাশি করতে বসবার ঘরে একটা পর্দার আড়ালে মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের কোটটি ছাড়া আর সব পোশাকই জড়ো করে রাখা আছে দেখা গেল। বোঝা গেল মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার ওই জানলা দিয়েই লাফিয়ে পড়েছেন। রক্তের দাগ দেখে মনে হল বেশ কিছুটা ধস্তাধস্তি করেই তাঁকে জানলা দিয়ে গলতে হয়েছে। তবে এটাও বোঝা গেল যে, এত চেষ্টা করেও মিঃ সেন্ট ক্লেয়ার শেষরক্ষা করতে পারেননি। কেননা নদীতে সে সময় প্রচণ্ড জোয়ার ছিল।

সেরকম অবস্থায় নদীতে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে নিজেকে বাঁচানো কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

"এখন এই অপরাধের সঙ্গে যে দু'জন একেবারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদের একজন হল ম্যানেজার। আর ম্যানেজারের পূর্ব-ইতিহাস পুলিশের সবই জানা। তবে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ারের কথা অনুযায়ী তিনি তাঁর স্বামীকে দেখবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঐ বাড়ির দরজার গোড়ায় ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সুতরাং মূল অপরাধের সঙ্গে তার যোগ থাকা সম্ভব নয়। এটা বলা যেতে পারে যে, অপরাধ নিজে না করলেও সে অপরাধমূলক ঘটনাটা ঘটতে সাহায্য করেছে। ম্যানেজার নিজের পক্ষ সমর্থন করে বললে যে, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। এ-ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ সে জানে না। আর তার দোতলার ভাড়াটে হিউ-বুনের কার্যকলাপ সম্বন্ধেও সে কিছু জানে না। বস্তুত অন্যের কথায় তার নাক গলাবার প্রয়োজন বা অধিকার নেই। মিঃ হিউ বুন কিন্তু মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের জামাকাপড় ওইভাবে ওখানে পড়ে থাকার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও দিতে পারলেন না।

"এই তো গেল ম্যানেজারের কথা। ওই যে বীভৎস বিকলাঙ্গর কথা বলেছি ওর নামই হিউ বুন। সব দিক বিচার করে দেখলে হিউ বুনই একমাত্র লোক যে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারকে সবশেষে দেখেছে। এই লোকটাকে লণ্ডন শহরের সব লোক চেনে। ওরকম ভীষণদর্শন মুখ আর লণ্ডন শহরে বোধহয় দুটি নেই। ও লোকটা জাতভিখিরি। তবে পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ও সাধারণত দেশলাই নিয়ে বসে থাকে। ও কোথায় বসে জানো ? গ্রেডনিডন স্ট্রিট দিয়ে কিছু দূর গেলে বাঁ হাতে দেখবে একটা বাড়ির দেওয়ালের কোণে ও আসনপিঁড়ি হয়ে রোজ বসে থাকে। ওর কোলের ওপর কয়েকটা দেশলাইয়ের বাক্স ছড়ানো থাকে। এমনিতে ওকে দেখলে খুব কষ্ট হয়। তার ফলে ওই রাস্তা দিয়ে যত লোক যায় তারা সকলে ওকে কিছু না কিছু পয়সা দিয়ে যায়। তাই ওর আয় খুব ভালই হয়। আমি নিজে ওকে বহুবার দেখেছি। অল্প সময়ের মধ্যে ও যে-রকম রোজগার করে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। ওর চেহারাটাই এমন যে ওকে লক্ষ না করে কেউ চলে যেতে পারে না। মাথাভর্তি লাল চুল। শীর্ণ মুখে একটা গভীর

কাটা দাগ। যেটার জন্যে ওর গালের চামড়াটা টেনে গিয়ে ওপরের ঠোঁটটা উলটে গেছে। ওর চোখদুটো কিন্তু আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ আর কালো। সব মিলিয়ে আর পাঁচটা ভিখিরির চাইতে ওকে সম্পূর্ণ আলাদা বলে মনে হয়। ওর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল ও খুব চটপট উপযুক্ত জবাব দিতে পারে। ওকে যদি কেউ কিছু বাঁকা কথা বলে তো ও সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখের মতো উত্তর দিয়ে দেয়। এখন এই লোকটিই আমাদের নিরুদ্দিষ্ট মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখেছে।"

আমি বললুম, "কিন্তু ও তো বিকলাঙ্গ! একজন বিকলাঙ্গের পক্ষে একজন সুস্থ সবল মাঝবয়সী লোককে খালি হাতে মেরে ফেলা কি সম্ভব?"

"বিকলাঙ্গ মানে ও খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে, পা-দুটো কমজোরি। তাছাড়া ও এমনিতে বেশ স্বাস্থ্যবান। তুমি তো ডাক্তার। সুতরাং ওয়াটসন, একথা তো তুমি জানো যে, দেহের কোনো অঙ্গ দুর্বল বা অপুষ্ট হলে অন্য অঙ্গ খুবই পুষ্ট হয়।"

"হুঁ, তা বটে। যাক গে,তুমি তোমার কাহিনী শেষ করো।"

"মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার তো জানলায় রক্তের দাগ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাই তাঁকে তক্ষুনি পুলিশের গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হল। আর তাছাড়া ওই ব্যাপারের তদন্তে তিনি কী সাহায্যই বা পুলিশকে করতে পারতেন। ওই তদন্তের ভার দেওয়া হল ইন্সপেক্টর বার্টনকে। তিনি তো ঘটনাস্থল যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু কোনোরকম উল্লেখযোগ্য কিছু দেখতে পেলেন না। অবশ্য ইন্সপেক্টর বার্টন একটা ভুল করেছিলেন। তাঁর উচিত ছিল গোড়াতেই হিউ বুনকে গ্রেফতার করা। অবশ্য সে ভুলটা তিনি পরে শুধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু যে সময়টুকু সে পেয়েছিল তাতে হয়তো সে ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সূত্র লোপ করে থাকতে পারে। তবে বুনকে তো গ্রেফতার করা হল, কিন্তু তার কাছে এমন কিছু পাওয়া গেল না, যাতে ওকে এ-ব্যাপারে দায়ী করা যায়। অবশ্য ওর জামার আস্তিনে রক্তের ছিটে লেগেছিল। সে বলে যে, তার আঙুল কেটে যায় আর সেই রক্তের দাগ তার জামায় লেগেছিল। আর মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার হৈ-চৈ শুরু করবার কিছুক্ষণ আগে সে জানলার কাছে গিয়েছিল, তখন হয়তো তার আঙুল ঘষে গিয়ে জানলার ফ্রেমে রক্ত লেগে থাকতে পারে। সে খুব জোর দিয়েই বললে যে, মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারকে সে কখনও দেখেনি। আর কী করে যে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের জামাকাপড় ওখানে গেল সেটা ও নিজেই বুঝতে পারছে না। তবে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার সম্বন্ধে ওর ধারণা যে, উনি ভুল দেখেছেন। যাই হোক, ওর আপত্তি সত্ত্বেও তো ওকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল। ইন্সপেক্টর অবশ্য ওখানে থেকে গেলেন। ভাবলেন জোয়ারের জল সরে গেলে যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায়।

"সূত্র অবশ্য পাওয়া গেল। তবে যা আশা করা গিয়েছিল তা নয়। দেখা গেল কাদায় মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের কোটটা আটকে রয়েছে। তবে মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের অথবা তাঁর দেহের কোনো চিহ্ন নেই। মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের কোটের পকেটে কী

পাওয়া গেছে অনুমান করতে পারো ?"

আমি বললুম, "না, অনুমান করতে পারছি না।"

"না, তুমি আন্দাজ করতে পারবে না। কোটের সবকটা পকেট খুচরোয় ভর্তি—পেনি, হাফপেনি। তার পকেটে চারশো একুশটা পেনি আর দুশো সত্তরটি হাফপেনি। এবার বুঝতে পারছ যে, খুচরো পয়সার ওজনের জন্যে ওই কোটটা জোয়ারের জলে ভেসে যায়নি। কিন্তু মৃতদেহের ব্যাপারটা আলাদা। মনে হয়, কাদায়, নুড়িতে কোটটা গেঁথে গিয়েছিল, কিন্তু প্রচণ্ড জলের টানে দেহটা ভেসে যায়।"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন বলেছিলে যে, মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের সব পোশাক ঘরে পুঁটুলি-করা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তাহলে কি মৃতদেহর পরনে শুধু একটা কোটই ছিল।" আমি প্রশ্ন করলুম।

হোম্‌স বললে, "না হে, তা নয়। তবে ব্যাপারটা এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক, এই বুন লোকটা নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারকে জানলা দিয়ে গলিয়ে ফেলে দেয়। সে কী করবে ? তার প্রথমেই মনে হবে যে, ওই জামাকাপড়গুলোর জন্যেই সে হয়তো ধরা পড়বে। প্রথমেই সে কোটটা ছুঁড়ে ফেলতে গেল। ফেলবার আগের মুহূর্তে তার মনে হল যে, কোটটা তো ডুববে না। জলে ভাসবে। অথচ তার হাতে সময় বেশি নেই। নীচে ম্যানেজারের সঙ্গে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ারের কথা-কাটাকাটি চলছে। হয়তো ম্যানেজারের কোনো সাকরেদ এসে তাকে পুলিশ আসার খবর দিয়ে গেছে। একদম সময় নেই, যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে। তখন কী করবে ভেবে সে দৌড়ে গেল তার লুকনো ভাঁড়ারে। যতগুলো সম্ভব খুচরো পকেটগুলোয় পুরে সে কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। অন্য জামাগুলো নিয়েও সে একই কাজ করত, কিন্তু ততক্ষণে সে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলে। কোনোরকমে সে জানলাটা বন্ধ করতে পারলে লোকজন উঠে আসবার আগেই।"

"এটা হয়তো হলেও হতে পারে।"

"যাই হোক, যতক্ষণ না এর চেয়ে আরও ভাল কোনো হাইপোথিসিস করা যাচ্ছে ততক্ষণ এই পথেই আমাদের এগোতে হবে। এদিকে বুনকে তো গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু থানায় গিয়ে দেখা গেল যে, কোনো অপরাধকর্ম সে আগে করেছে এমন কোনো তথ্য নেই। একথা ঠিকই যে, ভিক্ষে করাই তার পেশা, কিন্তু এমনিতে সে বেশ শান্তশিষ্ট প্রকৃতির লোক। এই তো হচ্ছে ব্যাপার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার ওখানে কী করছিল, ওখানে তার শেষ পর্যন্ত কী হল, সে কোথায় গেল, আর হিউ বুন এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে কীভাবে জড়িত। এইসব প্রশ্নের কোনোটারই উত্তরের সামান্যতম ইঙ্গিত আমার জানা নেই। সত্যি কথা বলতে কী, আমার এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এর আগে আমার হাতে এমন 'কেস' একটিও আসেনি যেটা প্রথমে খুবই সরল বলে মনে হলেও শেষকালে অসম্ভব রকমের জটিল রূপ নিয়েছে।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

তলব

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

ওই ওখানে পানের দোকান,
জর্দা দিয়ে খাচ্ছিল পান
কোন্ দিকে যে গেল পরে
দেখব কোথায় ? ছিলাম ঘরে।
দেখতে কেমন পড়ছে মনে ?
পাক দিয়েছে গোঁফের কোণে।
ভীষণ চেনা মুখের গড়ন
গাভাস্‌কার না কালীচরণ !
আরে মশাই, বয়স কত ?
এই ধরো না তোমার মতো।
কলেজ স্টুডেন্ট ? স্কুলের ছেলে ?
খবর দেব সময় পেলে।
ধুত্তোর ছাই ! গায়ের জামা ?
'নইকো আমি রামা-শ্যামা'
সাইন্‌বোর্ডের মতন লেখা
জামার ওপর যায় যে দেখা।
করছে গোপন নাম তা হলে ?
তলব করো জলে-স্থলে
চোখের জলে নাকের জলে—
না-হয় কাছেই ঢেন্‌কানলে ;
বেজায় চালাক আপনি মশাই !
—তোমায় এখন ছাড়ছি না তাই।

ছবি : দেবাশিস দেব

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা খুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো
তোমার খেলাঘর!"

— ফেভি ফেয়ারী

চট্‌পট্‌ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সমস্যটা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর**।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা--হাতি--বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিঁকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর**।

তোমার দরকার !

- কার্ডবোর্ড
- কার্ড-পেপার
- লাল ও গাঢ় খয়েরী রঙের পপলিনের কাপড়
- ভেলভেট পেপার
- কালোরঙের দড়ি
- চ্যাপটা সাদা সিল্কের দড়ি
- পুরোন বই থেকে ক্যানভাসের লাইনিং (অস্তর)
- ফেভিকল এম আর অ্যাডহীসিভ

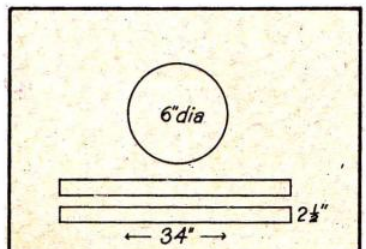

১। কার্ডবোর্ড থেকে ৬" ব্যাসে গোল করে কেটে নাও। তার সঙ্গে কার্ড-পেপার থেকে দুটি ২½" × ৩৪" ফালিও যেমনভাবে দেখানো হয়েছে তেমনিভাবে কেটে নাও।

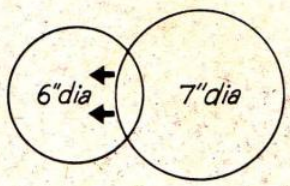

২। লাল পপলিনের কাপড় থেকে ৭" ব্যাসে গোল কেটে নিয়ে, ঐ কাটা কার্ডবোর্ডের চাকতির ওপর সেঁটে দাও। তারপর, ওর চারধারের বাড়তি কাপড়টুকু কার্ডবোর্ডের পেছনদিকে সেঁটে দাও।

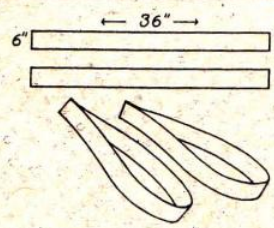

৩। গাঢ় খয়েরী রঙের পপলিন কাপড় থেকে দুটি ৬" × ৩৬" মাপের ফালি কেটে নিয়ে ঐ কার্ড-পেপারের ফালি এই কাপড়ের ফালির ওপর বসাও। চারধারের বাড়তি কাপড়টুকু ফেভিকল এম আর অ্যাডহীসিভ দিয়ে সেঁটে দাও—ওটি ফাঁস হিসেবে থাকবে।

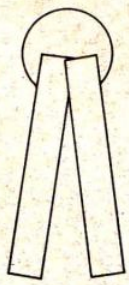

৪। এবার ঐ দুটি ফাঁস, বৃত্তাকারের পেছনে যেমনভাবে দেখানো হয়েছে তেমনিভাবে সেঁটে দাও।

৫। ভেলভেট পেপার থেকে, পুষি বেড়ালের জিভ, চোখ আর নাকের আকারে কেটে নিয়ে যেমনভাবে দেখানো হয়েছে তেমনিভাবে জোড়ো। মুখের ওপর আর পায়ের জন্যে ঐ ফাঁসের ওপর সাদা সিল্কের দড়ি আর চোখের পাতা ও গোঁফের জন্যে মুখের ওপর কালো দড়ি সাঁটো।

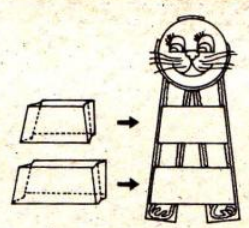

৬। কার্ড-পেপার থেকে, দুটি একেবারে সঠিক আকারের পকেট কেটে নাও। ওর কোণায়, পুরোন নোটবুক থেকে কাটা ক্যানভাস জুড়ে দাও, আর তার ওপর লাল রঙের পপলিনের কাপড় জুড়ে দিয়ে, পকেট এবার ফাঁসের ওপর সেটে দাও।

৭। কার্ডবোর্ড থেকে, পুষি বেড়ালের কানের আকারে কেটে নাও, আর তার ওপর ভেলভেট পেপার ও সাদা সিল্কের দড়ি চিটকে নিয়ে পুষি বেড়ালের মাথার ওপর সেঁটে দাও। ঐ দড়ি দিয়ে একটি আওটার মত তৈরী ক'রে, ফেভিকল এম আর অ্যাডহীসিভ দিয়ে যেমনভাবে দেখানো হয়েছে তেমনিভাবে সেঁটে দাও।

মিঁয়াও মিঁয়াও ! এই নাও পুষি বেড়াল তৈরী এবার,
এখন থেকে ও ধরে রাখবে সব বইপত্তর আর চিঠিপত্তর তোমার !

ফেভিকল এম-আর
সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® এইটি আর **ফেভিকল** ব্র্যাণ্ড, এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাস্টীজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

OBM/4442 BN

আজ রোভার্স বনাম চকফোর্ড। এফ. এ. কাপের খেলা। রয় জখম, তাই খেলছে না। চকফোর্ড পেনাল্টি পেয়েছে। ...

ব্যাপার কী? পেনাল্টি কেন?

কিসের পেনাল্টি?

গাথরির হ্যাণ্ডবল!

এইমাত্র চার্লি বাঁচিয়েছে একটা কঠিন শট ...

বলটা গাথরির হাতে লেগেছিল! আমার বিশ্বাস, ইচ্ছে করেই ও হাত লাগায়!

শুনে গাথরি তো খাপ্পা!

হঠাৎ লেগে যায়! ইচ্ছে করে লাগাইনি,

আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত!

তোমার নাম টুকে রাখছি!

রয় উদ্বিগ্ন ...

রয়!

গাথরি বোকামি করল!

মাঠ থেকে না বার করে দেয়!

গাথরিকে সরিয়ে দিল সবাই। ফ্রাঙ্ক শট নিচ্ছে ...

গোল চাই!

গোল চাই!

গোল চাই!

তা-ই হল!

দারুণ শট!

হুররে!

রেফারিটা ঘুষ খেয়েছে!

শান্ত হও ভিক!

গোল শোধ হয়ে যাবে!

রয়ের উদ্বেগ বাড়ছে ...

রয়, অবস্থা সুবিধের নয় ...

জানি। খেলোয়াড়দের মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে !

রয় ঠিকই বলেছে ...

তাড়াহুড়ো করে মারল !

তাই গোল শোধ হল না !

ঠাণ্ডা মাথায় খেলো হে !

হাফ-টাইমের ঠিক আগে ...

আঃ !

মার্ভিন এগোচ্ছে !

গোল হবে !

হয়েছে !

শাবাশ মার্ভিন !

রেফারি কিন্তু গোল দিলেন না ...

মার্ভিনের বিরুদ্ধে ফ্রি-কিক্ দিয়েছেন !

ও ঠেলেছিল !

এ কী !

হাফ-টাইম ...

মাথা ঠাণ্ডা রাখা শক্ত !

পাজি রেফারি !

ধেত্তেরি !

যথেষ্ট হয়েছ !

যাই হয়ে থাক, মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলতে হবে। নইলে গোল দিতে পারবে না !

চকফোর্ডও মরিয়া হয়ে খেলছে ...

রোভার্স আবার কর্নার পেল !

গোল তো হচ্ছে না !

মুশকিল হল দেখছি !

চালাও চকফোর্ড !

রয়কে জব্দ করে দাও !

লুকিয়ে খেলা দেখতে এসেছিল !

রোভার্সকে হারাবই !

রোভার্স কি তা হলে এফ·এ· কাপ থেকে ছিট্‌কে যাবে ?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আহা, কী অপরূপ রূপ পিয়ার্স-এর!

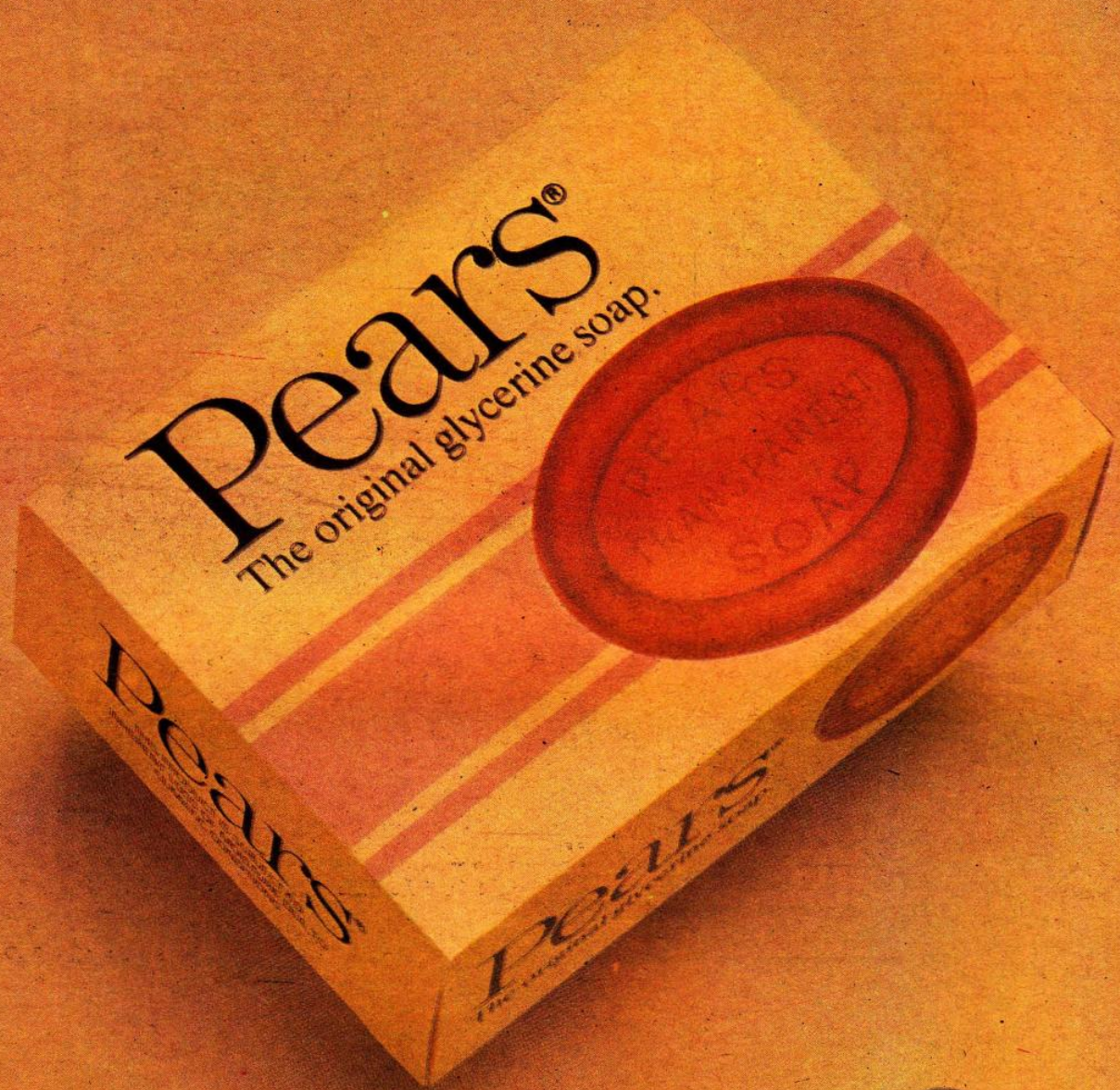

পিয়ার্স এবার এক অপূর্ব সুন্দর নতুন প্যাকে—এক বিশুদ্ধ, স্নিগ্ধ রূপ, যাতে ঝিলিক মারে ভেতরের সাবানটিরই স্বরূপ! পিয়ার্স—আসল গ্লিসারিন সাবান, যা বদলাতে— না কখনও আপনি চাইবেন, না আমরা!

পিয়ার্স সময়ের ছায়া পড়তে না দিয়ে আপনার ত্বকের গ্লানিহীন তারুণ্য বজায় রাখে!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS PS 62 2619 BG

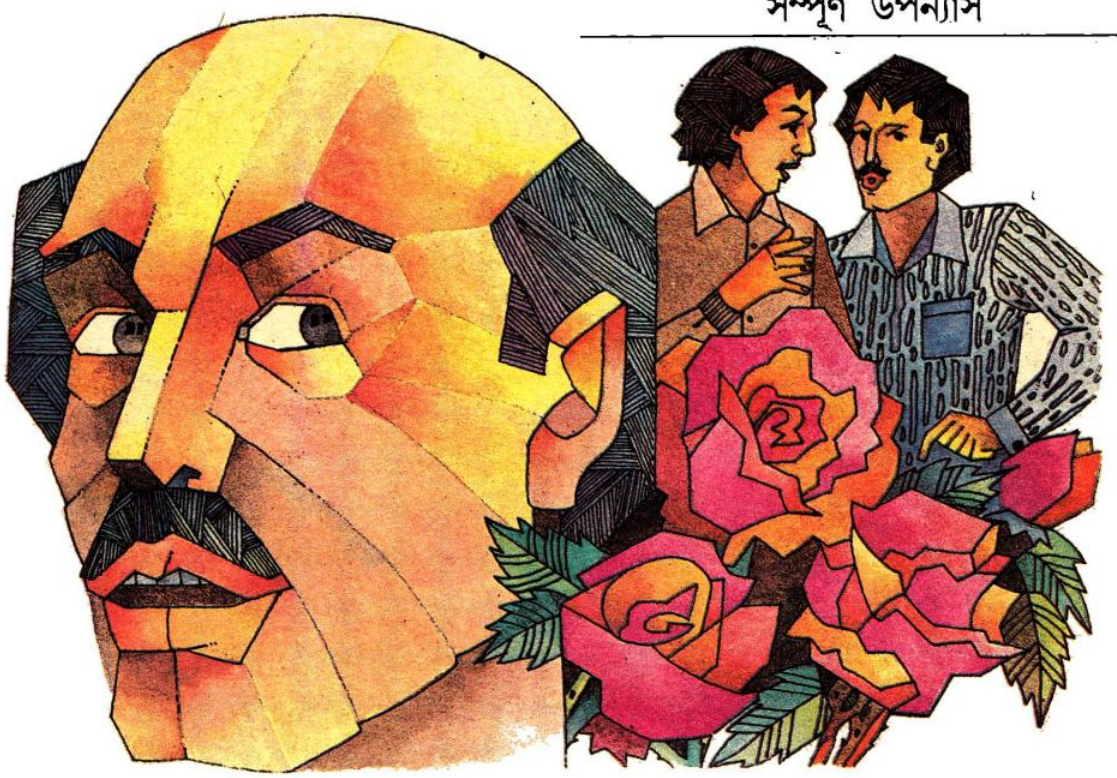

একদিন এক গোলাপবাগানে

বিমল কর

সামনে বড়দিন। অফিস থেকে বেরিয়ে অনিল ভাবছিল, একবার নিউ মার্কেটের দিকে যাবে। তার একটা প্যান্ট পড়ে আছে মাসুদ দরজির কাছে। যদি প্যান্টটা পাওয়া যায় ভাল। না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই, এই বড়দিনের সময় নিউ মার্কেটের চেহারা ফিরে যায়। কী সাজগোজ, কত মানুষজন, খানিকটা সময় বেশ কাটিয়ে দেওয়া যাবে ঘোরাঘুরি করে।

অনিল পা বাড়াতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখল, গোরা আসছে। হন্তদন্ত হয়েই আসছে যেন।

গোরা কাছে এল। বলল, "বেরিয়ে পড়েছিস ? আর একটু হলেই তোর দেখা পেতাম না। আবার বাড়ি ছুটতে হত। কোথায় যাচ্ছিস ? বাড়ি ?"

"না। ভাবছিলাম একবার নিউ মার্কেটের দিকে যাব।"

"খুব খারাপ খবর আছে।"

অনিল তাকাল। "খারাপ খবর ?"

"মতিকাকা পাগল হয়ে গিয়েছেন।" অনিল যেন প্রথমটায় খেয়াল করতে পারেনি, পরমুহূর্তে তার খেয়াল হল। বিশ্বাস করতে পারল না। "যাঃ !"

গোরা বলল, "খানিকটা আগে আমি খবর পেয়েছি। তোকে জানাতে এলুম।"

অনিল তখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না। অবাক হয়ে গোরাকে দেখছিল। দুঃসংবাদ মিথ্যে হয় না। তবু অনিল বলল, "তুই ঠিক বলছিস ?"

"জুড়ন কলকাতায় এসেছে। খবরটা দিতেই এসেছে। আমাদের একবার যেতে হবে।"

"কোথায় ?"

"মতিকাকার গোলাপবাগানে।"

"সে তো মধুপুরের কাছে !"

"হ্যাঁ। ওখানেই যেতে হবে। মিস্টিরিয়াস ব্যাপার। চল্, তোকে সব বলছি।"

অনিলের অফিস ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে। ধর্মতলার মুখ পর্যন্ত এগিয়ে গেলেই চায়ের দোকান। অনিলের আসা-যাওয়া আছে দোকানে। সামান্য পথ হেঁটে এসে চায়ের দোকানে বসল দু'জনে। অফিস ছুটির ভিড়। নিরিবিলি বসার জায়গা পাওয়া মুশকিল। তবু দোকানের এক ছোকরা পেছন দিকে একটা জায়গায় বসিয়ে দিল দু'জনকে।

অনিল চায়ের কথা বলল।

গোরা জল চাইল এক গ্লাস। তাকে খানিকটা বিচলিত দেখাচ্ছিছল।

অনিল তখনও ধাঁধার মধ্যে রয়েছে। মতিকাকা তার নিজের কাকা নয়, গোরার কাকা। গোরার বাবার খুড়তুতো ভাই। অনিল গোরার বন্ধু। দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও রয়েছে দুই বন্ধুর মধ্যে। নিজের না হলেও মতিকাকাকে বরাবর

কাকার মতনই ভক্তিশ্রদ্ধা করেছে অনিল। মানুষটি বড় ভাল। অনিলদের খুবই স্নেহ করেন। সেই মতিকাকা হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছেন ভাবতে অনিলের খারাপ লাগছিল।

গোরা নিজেকে সামলে নিল। জল খেয়ে বড় করে নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "জুড়নের কাছে আমি যা শুনলাম, তোকে বলছি।"

"বল।"

"তুই তো জানিস, মতিকাকা ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে কাজকর্ম করেন। খাওয়া, শোওয়া,বসা—সবই নিয়মে।"

অনিল ঘাড় নাড়ল। সে মতিকাকার স্বভাব জানে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যা যা করেন মতিকাকা সব যেন রুটিন-মাফিক। এত নিয়ম মেনে কাজ করলে মানুষকে একটু খেপাটে মনে হয়। তা বলে মতিকাকাকে খেপা বলা যাবে না। বড়জোর বলা যেতে পারে, অনেক ব্যাপারে কাকা খেয়ালি, কোনো-কোনো ব্যাপারে জেদি, আবার দু'চারটে বিষয়ে অবুঝ। মানুষটা যদি খেয়ালি আর অবুঝ না হবেন—কলকাতার ঘর-বাড়ি, ভাল চাকরি ছেড়ে গোলাপবাগান করতে মধুপুরের দিকে ছুটে যান!

গোরা বলল, "ঘটনাটা ঘটেছে দিন তিন-চার আগে। ঠিক-ঠিক বললে, গত মঙ্গলবার—মানে উনিশ তারিখ বিকেলে।"

"উনিশ !···আজ বাইশ। হ্যাঁ, চার দিনই।"

"সকাল বা দুপুরে কাকার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি। রোজ যেমন সাতসকালে ঘুম থেকে ওঠেন, তেমনই উঠেছেন। মুখ ধুয়ে চা খেয়ে গরম জামাকাপড় পরে হাঁটতে বেরিয়ে গিয়েছেন। তারপর রোজই পর-পর যেভাবে যা-যা করেন, সবই করেছেন। দুপুরেও কিছু বোঝা যায়নি। বিকেলে মতিকাকা গোবিন্দ মালীর সঙ্গে গোলাপবাগানের দেখাশোনা করছিলেন। দেখাশোনা করার সময় হঠাৎ মতিকাকার কী যেন হয়ে যায়! ভীষণ ভাবে চিৎকার করে ওঠেন কাকা। গোবিন্দ কিছুই বুঝতে পারেনি। সে কাকার চিৎকার শুনে ছুটে আসে। কাকাকে যেন সাপে কামড়েছে এইভাবে ফুলগাছের দিকে তাকিয়ে কাকা কেমন ভয়ে নীল হয়ে যেতে লাগলেন, কাঁপতে লাগলেন। তরপর অজ্ঞান হয়ে বাগানে পড়ে গেলেন।"

অনিল অবিশ্বাসের গলা করে বলল, "বলিস কী?"

"আমি তো চোখে দেখিনি, যা বলেছে জুড়ন, তাই বলছি।"

"তারপর?"

"তারপর গোবিন্দর হাঁকডাক শুনে অন্যরা ছুটে আসে। কাকাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়।"

"ডাক্তার?"

"ওই বনবাদাড়ে ডাক্তার কোথায়? খানিকটা তফাতে এক বুড়ো ভদ্রলোক থাকেন-দেখেছিস তো পুলিনবাবুকে। কবিরাজি হোমিওপ্যাথি—দুই-ই করেন। দেহাতের লোক তাঁর ওষুধ খায়। সেই পুলিনবাবুকে ডেকে আনা হয়। তিনি বললেন, মৃগী। ভয় নেই। বলে কিছু হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিলেন। ওষুধে কাজ কিছুই হল না। পরের দিন সকাল থেকে মতিকাকা পাগলের মতন কথাবার্তা বলতে লাগলেন।"

চা-টোস্ট এসেছিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে অনিল বলল, "পাগলের মতন কথাবার্তা মানে?"

"মানে পাগলরা যেমন বলে, কোনো কথার সঙ্গে পরের কথার মিল নেই।"

"যেমন?"

"আমি অত বলতে পারব না। নিজেরা গিয়ে দেখলে-শুনলে বুঝতে পারব। তবে জুড়নের কথা থেকে মনে হল, মতিকাকা হ্যালুসিনেশান দেখছেন।"

"হ্যালুসিনেশান?" অনিল কেমন থতমত খাবার মতন করে বলল।

"হ্যাঁ। আমরা বাংলায় কী বলব হ্যালুসিনেশনকে? ভ্রম, না, মতিভ্রম?"

"কী জানি। শুনেছি, হ্যালুসিনেশনে লোকে উদ্ভট জিনিস ভাবে আর দেখে।"

গোরা বলল, "কাকাও শুনলাম উদ্ভট কথাবার্তা বলছেন।"

অনিল চা খেতে লাগল। কৌতূহল কম হচ্ছিল না তার। বলল, "দু-একটা শুনি। জুড়ন বলেনি?"

মাথা হেলাল গোরা। বলল, "বলেছে। গোলাপবাগান তছনছ করে দিতে বলছেন কাকা। কখনও বলছেন, বাগানে আগুন লাগিয়ে দাও; কখনও বলছেন, গাছগুলো উপড়ে মাটি খুঁড়ে ফেলো; কখনও আবার বলছেন, বাগানে কেউ যেও না, ওই বাগান মরণ-ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে···।"

অনিল বলল, "পাগলামি!"

"পুরো। কিন্তু কেন? একজন সুস্থ-সবল মানুষ—আচমকা পাগল হবেন কেন? কী আছে বাগানে?"

"বাগানে কিছু নেই। কাকা আজ সাত-আট বছর ধরে ওই বাগান নিয়ে আছেন। এতকাল যদি বাগানে ভয়ের কিছু না থেকে থাকে—হঠাৎ সেই বাগানে ভয়ের ব্যাপার কী ঘটতে পারে?"

গোরা ঘাড় দোলাল। "আমারও তাই মনে হয়।···তা নিজেরা একবার ওখানে না গেলে বুঝতে পারছি না। কাকাকে দেখা দরকার। তুই কাল যেতে পারবি না? আমার সঙ্গে চল্। আমি কালকেই যাব ভাবছি। তোর কাছে এসেছি তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব বলে।"

অনিল একটু ভাবল। বলল, "অসুবিধে নেই। কালই যেতে পারব। অফিসে বলে নেব একবার। ক্রিসমাসের ছুটি আছে দু' একদিন। ওরই সঙ্গে আরও দু' চার দিন জুড়ে নেব।"

"বাঁচালি ভাই। একলা যেতে ভয় করছিল।"

॥ দুই ॥

রাত দশটার গাড়ি। প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ভিড় ভয়ংকর না হোক, ভালই বলতে হবে। শীতও পড়েছে জাঁকিয়ে।

অনিলরা ভাগ্যবান। এমন একটা কামরায় উঠল, যে-কামরায় শোবার জায়গা পাওয়া গেল। আসলে কামরাটায় একটিমাত্র আলো জ্বলছে, বাকি আলো খারাপ। অন্ধকার কামরায় অনেকেই উঠতে রাজি হয়নি। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এমনিতেই চুরিচামারি বেশি হয়; পায়ে-পায়ে গাড়ি থামে, যাত্রী ওঠানামা করে, কে কখন কার জিনিস নিয়ে নেমে পড়বে,

খেয়াল রাখা যায় না। এরপর যদি অন্ধকার কামরা হয়, চোরদের আরও সুবিধে।

অনিলদের লটবহর নেই, চুরি যাবার মতনও কিছু ছিল না তাদের কাছে। মামুলি দুটো কিট্-ব্যাগ, আর একটা করে কম্বল। কিট্-ব্যাগ মাথায় দিয়ে জুতোজোড়া মাথার কাছে রেখে দুই বন্ধু বাংকের ওপর শুয়ে পড়ল।

ট্রেন ছাড়ার খানিকটা পরেই বোঝা গেল শীত কাকে বলে। ডিসেম্বরের শেষ প্রায়, লিলুয়া পেরুতেই পৌষের দাপটটা বোঝা যাচ্ছিল।

গোরা বলল, "দুটো মাংকি ক্যাপ নিয়ে এলে হত রে, অনিল। কানের মধ্যে দিয়ে শীত ঢুকে যাচ্ছে।"

অনিল বলল, "মাফলার জড়িয়ে নে মাথায়।"

"তুই নিয়েছিস?"

"হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণ দুই বন্ধু কথাবার্তা বলল, সাধারণ কথা। কামরায় লোক কম। গাড়ি ছাড়ার পর খানিকক্ষণ প্রায় সবাই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। তারপর ধীরে ধীরে চুপ করে গেল। প্রত্যেকটি স্টেশনে গাড়ি থামলেও যাত্রীদের ওঠানামা তেমন নেই। অন্ধকার কামরা বলেই বোধহয় ওঠার যাত্রী পাওয়া যাচ্ছিল না।

দেখতে-দেখতে রাত বাড়ল। গাড়ি শ্রীরামপুর ছাড়িয়ে গিয়েছে।

গোরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অনিল ঘুমোয়নি। ট্রেনে সহজে তার ঘুম আসতে চায় না।

অনিল চোখ বন্ধ করে শুয়ে-শুয়ে মতিকাকার কথা ভাবছিল। গতকাল থেকেই ভাবছে অবশ্য, কিছুই বুঝতে পারছে না।

মতিকাকার ষোলো আনা কথা অনিল হয়তো জানে না, তবে আট-দশ আনা জানে বইকী। মতিকাকার পুরো নাম মতিলাল দত্ত। লোকে ছোট করে বলে মতি দত্ত।

মতিকাকাদের বাড়ি বরানগরে। দুই পুরুষের বাড়ি। বনেদি পরিবার। মতিকাকারা দুই ভাই। বাড়ির দুই অংশ। এক অংশ মতিকাকার, অন্য অংশ মতিকাকার দাদার। ভাইয়ে-ভাইয়ে অমিল ছিল না। তবু মতিকাকা একদিন হুট করে তাঁর অংশ বেচে দিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন।

এক-একজন মানুষ থাকে, যারা বড় খামখেয়ালি হয়। মতিকাকাকে বোধহয় সেই দলে ফেলা চলে। নামকরা কম্পানির কেমিস্টের ভাল চাকরি আর বরানগরের বাড়ি বেচে দিয়ে কোন্ বুদ্ধিমান মধুপুরের দিকে চলে যায়! মতিকাকার দাদা নাকি বলেন, বিয়ে-থা করেনি, কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, সংসার নেই—তাই মতি এ-সব খামখেয়ালি কাণ্ড করল। একদিন বুঝতে পারবে। আরও বয়েস হোক, তখন বুঝবে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা কাকে বলে।

মতিকাকার বয়েস এখন মোটামুটি সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। তা প্রায় বছর ছয়-সাত হবে মতিকাকা কলকাতা-ছাড়া। বছরে এক-আধবার কলকাতায় আসেন অবশ্য, দাদার কাছেই ওঠেন, তবে হপ্তাখানেকের বেশি থাকেন না।

কেন যে একটা মানুষ সব ছেড়েছুড়ে বাইরে গিয়ে গোলাপবাগান নিয়ে মাতলেন, তা এমনিতেই রহস্যময়। তবে সাদামাটা ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, মতিকাকা এক

ধরনের হাঁপানিতে ভুগছিলেন। সাধারণ হাঁপানির সঙ্গে এর খানিকটা তফাত আছে। অনিলরা অন্তত তেমনই শুনেছে। শুনেছে, জন্মকাল থেকেই কাকার কেমন একটা খুঁত রয়েছে বুকে, তার ফলে অনেক জিনিসই তাঁর সহ্য হয় না, বুকের এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, ধুলো-ধোঁয়া, ভিড়, উত্তেজনা, উদ্বেগ—আরও অনেক কিছু থেকে তাঁকে এড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছিল। মতিকাকা নাকি সেইজন্যই কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন।

অনিল অতশত বোঝে না, তবে এটুকু বলতে পারে, নিজের মনোমতন জায়গা বেছে নিয়ে, সেখানে এক মস্ত গোলাপবাগান করে মতিকাকা ভালই আছেন।

মাঝেসাঝে অনিলরা মতিকাকার কাছে বেড়াতে যায়। এই তো গরমে গিয়েছিল একবার। দিন তিনেক ছিল। অনিলদেরও জায়গাটা বেশ পছন্দ। বিঘে দু'আড়াই জমি, চারদিকে কম্পাউণ্ড ওয়াল, বিঘে দেড়েকের মতন জায়গা নিয়ে গোলাপবাগান। অবশ্য গোলাপবাগান বলতে শুধু গোলাপই নয়, অন্য ফুলের গাছও আছে, তবে গোলাপই বেশি। এই বাগানের দেখাশোনা করে মালী আর মতিকাকারা ক'জন। দু' দুটো কুয়ো আছে বাগানে। গরমকালে জলের খানিকটা টানাটানি থাকে বলে দুটো কুয়োর ব্যবস্থা। কাকা থাকেন বাগানের লাগোয়া কটেজে। কটেজের গাঁথুনি ইঁট আর চুনসুরকির, মাথার ছাদ খাপরার। কটেজের চেহারাটা ছোট স্কুল কিংবা মফস্বলের হাসপাতাল-বাড়ির মতন। গোটা তিনেক ঘর। বড় ঘরে থাকেন কাকা। অন্য ঘরে জুড়ন আর অমর। একটা ঘর ফাঁকাই পড়ে থাকে। রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর আলাদা। কেশব ঠাকুর রান্নাবান্না করে। মালীর থাকার ব্যবস্থা নার্সারিঘরের পাশে।

মতিকাকার গোলাপবাগানের ব্যবসা সামলায় অমর। জুড়ন করে ছোটাছুটি। কাকার গোলাপের চাহিদা আছে। কাছাকাছি শহরে যত না চালান যায় গোলাপ, তার চেয়ে বেশি যায় পাটনায়। কলকাতাতেও চালান আসে। নিউ মার্কেটের পিয়ারিলাল কাকার গোলাপ নেয়।

সত্যি বলতে কী, গোলাপবাগানের আয়ে মতিকাকার অতগুলো পুষ্যির খাওয়া-পরা চলে না। ধানের জমিও কাকাকে খানিকটা রাখতে হয়েছে। তবে সাদামাটা খাওয়া-দাওয়া, বাড়তি খরচ বলে কিছু নেই, যা আয় হয়, তাতে চলে যাবারই কথা।

গোলাপবাগান আগলে আর নিরিবিলিতে জীবন কাটাবেন

বাবুলের বুলি-২

কি মজা তাধিন্‌ধিন্‌
আজকে ছুটির দিন

এই কথাটি বল্‌তে চাও,
আগে ডানহাতে
বাঁ কান আর বাঁ হাতে
ডানকানের ডগায়
টান মার, তারপর বাব্‌ল
বানাও যতবড় পার।

বিগ ফান-এর বিরাট
বাব্‌ল বন্ধুদের তাক্‌
লাগাবে কেবল !
বাব্‌ল বানানো একদম
সোজা, এই খেলাতে
অফুরান মজা।

জানতো কি করে বিগ ফান দিয়ে, মস্ত বাব্‌ল ফেলবে বানিয়ে ?

মুখে ফেল বিগ ফানের
বাবলটা, তারিয়ে
তারিয়ে চিবোও যতক্ষণ
না হয় চিঁড়েচ্যাপ্টা।

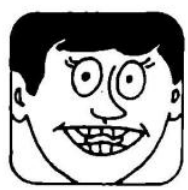

সামনের দাঁতের
পেছনের দিকে জিভের
ডগাটি দিয়ে ঠেসে
ধর তাকে।

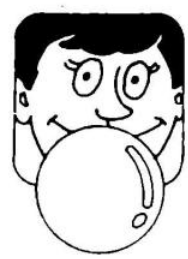

জিব-দিয়ে-করা খালি
জায়গায় ফুঃ ফুঃ দাও ফুঁ
যত পারা যায়।
উচ্ছ্বাস, তারপর
বাব্‌ল এক জ-ব্ব-র !

বিগ ফান
বাব্‌ল গাম

মস্ত বড়ো বাব্‌ল...
একেবারে সোজা!

Trikaya-GP.11.84 BEN

স্থির করে নিয়ে কাকা তো ভালই কাটাচ্ছিলেন দিনগুলো, হঠাৎ পাগল হয়ে গেলেন কেন ?

॥ তিন ॥

মধুপুরের আগেই নামতে হয়। গাড়ি পৌঁছল আটটা নাগাদ। রোদে টলটল করছে শীতের সকাল।

স্টেশনের বাইরে এসে অনিল বলল, "জুড়নকে তুই বলিসনি আমরা কখন আসব ?"

"আসব বলেছিলাম। কবে কখন, বলিনি। ঠিক ছিল না।"

"তা হলে চল হাঁটি। মাইলটাক পথ। রোদে আরাম লাগবে।"

গোলাপবাগানের একটা সাইকেল-রিকশা আছে। নিজেদের কাজেকর্মে সেটা চালানো হয়। গোবিন্দ মালী চালায়। এ-ছাড়া সাইকেলও আছে একটা। জুড়নের জানা ছিল না গোরারা কখন আসছে, সাইকেল-রিকশা পাঠায়নি।

দুই বন্ধু হাঁটতে লাগল। কাঁধে কম্বল, হাতে কিট-ব্যাগ। এই জমজমাট শীতে চারদিক বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। রাস্তা কাঁচা, মেঠো পথই বলা যায়। রাস্তার দু'পাশেই মাঠ, গাছপালা, পরপর কত দেবদারু গাছ, কুল আর আতাঝোপেরও অভাব নেই। ছোট-ছোট খেতি দু'পাঁচটা। কপি কড়াইশুঁটি টমাটোর সবজিবাগান।

হাঁটতে-হাঁটতে গোরা বলল, "আমার বড় ভয় করছে রে !"

ভয় না হোক, কেমন এক অস্বস্তি অনিলেরও করছিল। গোলাপবাগানে গিয়ে মতিকাকাকে কেমন দেখবে কে জানে ! অনিল বলল, "ভয় করে আর কী হবে ! চল দেখি—অবস্থা কেমন ?"

গোরা বলল, "কাল গাড়িতে ঘুমোতেও পারিনি। একবার করে ঘুম আসছে আর অদ্ভুত-অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি। ভয়ের স্বপ্ন।"

অনিল ঠাট্টা করে বলল, "বাজে বকিস না। টেনে ঘুম মারলি সারা রাত।"

গোরা প্রতিবাদ করে বলল, "চুপ করে শুয়ে থাকলেই ঘুম হয় !"

অনিল কিছু বলল না।

খানিকটা পরে গোরা আবার বলল, "আমি ভাবছি, কাকার যদি বাড়াবাড়ি অবস্থা দেখি, তা হলে কী করব ? কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে ট্রিটমেন্টের জন্যে। এখানে ফেলে রাখার কোনো মানেই হয় না।

"তুই কী বলিস ?"

অনিল বলল, "মতিকাকার দাদাকে খবর দেওয়া হয়নি ?"

"জুড়ন দিয়েছিল। ওদের বাড়িতে অসুখ-বিসুখ চলছে। কী বলেছে আমি জানি না।"

"ঠিক আছে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে।"

আরও খানিকটা এগিয়ে দূরে গোলাপবাগান দেখা গেল। গোরা বলল, "ওই যে ! আমার ভাই বুক-ধড়ফড় শুরু হয়ে গেছে।"

"তুই বড় নার্ভাস।"

গোলাপবাগানের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে অনিলেরও যেন ভয়-ভয় লাগল। সুস্থ সবল প্রাণখোলা একটা মানুষকে কেমন দেখবে কে জানে।

ফটক খুলে পা বাড়াতেই মালীকে চোখে পড়ল। কুয়োতলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। গোবিন্দ মালী তাদের দেখতে পেল।

বাগানের রাস্তা দিয়ে দু'জনে যেন অস্বস্তির সঙ্গে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। একেবারে চুপচাপ সব। পাখির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। মতিকাকার গোলাপবাগান এত নিঝুম থাকে না।

আরও কয়েক পা এগুতেই মতিকাকাকে চোখে পড়ল। বাড়ির বারান্দায় রোদের মধ্যে বসে আছেন।

গোরা বলল, "ওই তো কাকা বসে আছেন।"

অনিল বলল, "আমাদের দেখতে পেয়েছেন।"

অস্বস্তি আর ভয়ের সঙ্গে এগিয়ে গেল দু'জনে। বারান্দার গায়ে এসে দাঁড়াল।

মতিলাল দু'জনকে দেখলেন। "তোমরা ?"

অনিলরা মতিকাকাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দাড়ি কামানো হয়নি, মাথার চুল উশকো-খুশকো, কপালটা কালো দেখাচ্ছিল। অসুস্থ মানুষকে যেমন দেখায়, সেই রকমই দেখাচ্ছিল কাকাকে, পাগল বলে মনে হচ্ছিল না।

গোরা বলল, "বড়দিনের ছুটি আছে তিন-চার দিন। চলে এলাম।"

"এসো" মুখে বললেন মতিলাল, কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ।

অনিল আর গোরা লক্ষ করল, অন্য সময় যখনই তারা এসেছে মতিকাকার কাছে, তাঁর অভ্যর্থনার ধরনই ছিল আলাদা। চেঁচিয়ে হেসে দু'হাতে টেনে নিয়ে, হইচই করে তিনি তাদের অভ্যর্থনা করতেন। আর আজ যেন একেবারে ঠাণ্ডাভাবে 'এসো' বললেন।

গোরা বলল, "জুড়ন কলকাতায় গিয়েছিল।"

"জানি," মতিলাল কথা শেষ করতে দিলেন না অনিলকে। "জুড়ন তোমাকে খবর দিয়ে এসেছে। বরানগরেও গিয়েছিল।"

গোরা চুপ।

"তোমরা আমায় দেখতে এসেছ," মতিলাল বললেন, "আমি জানতাম তোমরা আসবে।" বলে অনিলের দিকে তাকালেন, তারপর আচমকা বললেন, "কেমন দেখছ আমাকে ?"

অনিল বোবা। কী বলবে সে ?

মতিলাল সামান্য অপেক্ষা করলেন, "কী হে অনিল ? কথা বলছ না ?"

অনিল ঢোঁক গিলে বলল, "না, মানে··· এমনিতে ঠিকই দেখাচ্ছে। তবে মনে হচ্ছে আপনার শরীরটা ভাল নয়।"

"ভাল নেই। ···তা আমাকে কী পাগল মনে হচ্ছে ?"

অনিল মাথা নাড়ল। পাগলের কোনো লক্ষণ সে দেখছে না।

"এরা আমায় পাগল ভাবছে," মতিলাল বললেন, "আমার সামনে চুপ করে থাকলেও ওদের কথাবার্তা কাজ থেকে আমি বুঝতে পারছি—আমার পোষ্যরা আমায় পাগল ভাবছে।"

গোরা মাথা নাড়ল। "আপনার নাকি দিন-কয়েক আগে বাগানে কাজ করতে করতে হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে পড়ে ?"

মতিলাল ঘাড় নাড়লেন। "হ্যাঁ। কথাটা ঠিকই। কিন্তু কী

হয়েছিল তা তোমরা জানো না। এরাও ভাল করে জানে না। ...যাক্, সে-কথা পরে শুনো। আগে হাতমুখ ধুয়ে কিছু খাও, চা খাও—তারপর বলব। ...একটা কথা শুধু বলি—আমার এই সাধের গোলাপবাগান এখন আর সেফ্ নয়।"

॥ চার ॥

অনিলরা ট্রেনের জামাপ্যান্ট বদলে হাতমুখ ধুয়ে নিল। চা-জলখাবার শেষ করে মতিকাকার কাছে গিয়ে বসল। ভাবল, কাকার মুখে সব শোনা যাবে। জুড়ন কী বলেছে না বলেছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

মতিলাল কিন্তু নিজের কথা বলছিলেন না। কলকাতার খবরাখবর নিলেন দু'চার কথায়, অন্য পাঁচটা কথা বললেন, নিজের ব্যাপারে কথাই তুললেন না।

অনিল বুঝতে পারছিল না, মতিকাকা এমন চুপচাপ, বিমর্ষ হয়ে কী ভাবছেন! কেন তিনি আসল কথা তুলছেন না।

গোরার সঙ্গে চোখে-চোখে কথা হল। শেষে অনিল বলল, "আপনার কী হয়েছিল?"

মতিলাল কথাটা শুনলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

গোরা বলল, "আপনি বাগানে কাজ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন?"

মতিলাল গোরার দিকে তাকালেন। বললেন, "তোমরা আর কী শুনেছ?"

অপ্রস্তুত হল গোরা। মতিকাকা কখনও এমন গম্ভীর থাকেন না; কথাও বলেন না এ-ভাবে। উনি যেন অসন্তুষ্ট।

মাথা চুলকে গোরা বলল, "জুড়ন যা বলেছে, আমরা তাই শুনেছি, অনিল শুধু শুনেছে আপনার শরীর খারাপ।"

"জুড়ন কী বলেছে?"

গোরা ইতস্তত করে বলল, "জুড়ন বলছিল, আপনি বিকেলের দিকে বাগানে কাজ করতে-করতে হঠাৎ ভীষণভাবে চেঁচিয়ে ওঠেন। তারপর অজ্ঞান হয়ে যান। ওরা আপনাকে ধরাধরি করে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়। পুলিনবাবু আপনাকে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, মৃগী রোগ।"

"মৃগী রোগ আমার কস্মিনকালেও ছিল না। এই বয়সে হঠাৎ মৃগী রোগ হবে? পুলিনবাবু কিছু জানেন না।"

অনিল বলল, "আমরা ভেবেছিলাম, হার্ট বা মাথা, মানে ব্লাডপ্রেশার থেকে কিছু হতে পারে।"

"না, না," মতিলাল মাথা নাড়লেন, "আমার ব্লাডপ্রেশার নেই। আর ঠিক সে-ভাবে হার্টের কোনো অসুখও নেই। যেটা ছিল তাকে লাংস-এর অসুখ বলা যায়। এখন সেটা তো নেই। বুঝতে পারি না অন্তত। এক-আধবার অ্যালার্জি-মতন হয়, নিশ্বাসের কষ্ট থাকে এক-আধ দিন। তারপর যেমন-কে তেমন। ...যাক্‌গে, জুড়ন আর কী বলেছে?"

গোরা চট করে কিছু বলল না। ভেবেচিন্তে আমতা-আমতা করে বলল, "ও বলছিল, আপনি অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলেন, মানে মনে-মনে অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখেন...।"

মতিলাল গোরার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কথা শুনছিলেন। গোরা চুপ করে যাবার পর কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না উনি। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, আমি দেখি। মানে দেখেছি। অদ্ভুত দৃশ্যই দেখেছি। কিন্তু তোমরা যা ভাবছ, মনে-মনে দেখছি—তা নয়, আমি চোখের সামনেই দেখেছি।"

"কী দেখেছেন?" অনিল জিজ্ঞেস করল।

"এখন বলব না। বললে তোমরা ভাববে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। বিকেল হোক। হয়তো সেই পাগলামি এখনও রয়েছে। বিকেলে তোমাদের বলব। তোমরা বুঝতে পারবে, আমি কী দেখেছি।"

অনিলরা আর কিছু বলল না। বুঝতেই পারল, মতিকাকা এখন কিছু বলবেন না।

উঠে পড়ল দু'জনে।

বাগানে ঘোরাঘুরি করল সামান্য। এবার শীতে গোলাপের বাহার মাঝারি। হয়তো আরও সামান্য পরে বাগান ভরে উঠবে। গোবিন্দ মালী কাছাকাছি নেই, থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করা যেত। জুড়নও বাড়িতে নেই। সে সাতসকালে কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে সাইকেলে চেপে, ফিরতে বেলা হবে।

অনিলরা বাগানের পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এসে অমরকে ধরল।

অমর তার নার্সারি-ঘরে বসে চিঠিপত্র লিখছিল। ফুল বিক্রির হিসেব, টাকার তাগাদা। গোলাপচারার জন্যেও চিঠি আসে নানান জায়গা থেকে, তার জবাবও লিখতে হয় অমরকে।

অনিলরা বাইরেই বসল। বাইরে বেঞ্চি পাতা রয়েছে।

অমর বাইরে এল। বলল, "একটা বিড়ি খেয়ে নিই। তোমরা এসেছ শুনেছি।"

বিড়ি ধরিয়ে নিল অমর। "বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"হয়েছে। বাবু যেন কেমন বদলে গিয়েছে, অমরদা।"

"তাও তো প্রথম দিকে দেখোনি," অমর রোদে দাঁড়িয়ে হাই তুলে জড়তা ভাঙল। বলল, "প্রথম দু' দিন আমরা বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বাবুকে এখানে রাখাই যাবে না। জুড়নকে আমিই কলকাতায় পাঠিয়েছিলাম। এখানে আমরা কতটুকু কী করতে পারি, বলো। না ডাক্তার, না হাসপাতাল! ভগবানের দয়ায় বাবুর সেই অবস্থাটা কেটে গেল। পরশু থেকে ওঁকে খানিকটা ভাল দেখছি।"

অনিল বলল, "কী হয়েছিল, ঠিক করে বলো তো?"

"কী হয়েছিল, তা তো বলা মুশকিল! আমি কাছে ছিলাম না। বাবু বাগানে ছিলেন। গোবিন্দ মালী কাজ করছিল। বিকেল শেষ হয়ে আসছে তখন। মালীর বাগানের কাজও প্রায় শেষ। বাবু—ওই যে পশ্চিম দিকে—যেখানে একটা চৌবাচ্চার মতন করা আছে জল জমিয়ে রাখার জন্যে, দেখেছ তো?"

দেখেছে অনিলরা চৌবাচ্চা। বাগানে জল দেবার সুবিধের জন্যে এ-রকম চৌবাচ্চা গোটা-দুই আছে। কুয়োতলা থেকে টেনে এনে জল দেবার অসুবিধে বলেই, পুবে পশ্চিমে দুটো বড়-বড় চৌবাচ্চা আছে জল জমিয়ে রাখার জন্যে।

অমর বলল, "বাবু ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওঁর হাতে একটা বড় কাঁচি ছিল। ডালপালা কাটার জন্যে। হঠাৎ নাকি বাবু ভীষণভাবে চেঁচিয়ে ওঠেন। গোবিন্দ খানিকটা তফাতে ছিল। বাবুর চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখে, বাবু টলছেন। সে ছুটে আসতে-আসতে বাবু বাগানের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অজ্ঞান। ভাগ্যিস কাঁচিটা পড়ে গিয়েছিল হাত থেকে, নয়তো কী যে হত কে জানে!"

"কাকা মাটিতে পড়েই অজ্ঞান হয়ে যান?"

"হ্যাঁ। ওঁকে যখন বাড়ির মধ্যে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল,

তখন ওঁর সমস্ত শরীর কেমন বেঁকে যাচ্ছিল, গায়ের রঙ কালচে হয়ে গিয়েছে। চোখ বোজা, মুখের চেহারাই পালটে গিয়েছে।"

"মুখে গ্যাঁজলা উঠছিল?" গোরা বলল।

"না। ঠোঁট, নাক এত নীল হয়ে গিয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে।"

"তারপর?"

"সারা রাত্তির বাবুর হুঁশ থাকল না। আমরা তাঁকে ঘিরে বসে থাকলাম। সকালের দিকে বাবুর হুঁশ এল। তবে তিনি বিকার বকতে লাগলেন।"

অনিল বলল, "বিকার? কেমন বিকার?"

অল্প চুপ করে থেকে অমর বলল, "যা বলছিলেন, তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। একবার বলছেন, গোলাপবাগানের মাথার ওপর আর-একটা গোলাপবাগান; একবার বলছেন—সমস্ত গোলাপবাগান ধোঁয়ায়-কুয়াশায় ভরে গিয়েছে; আবার বলছেন—গোলাপগাছগুলো লম্বায় তালগাছের মতন হয়ে গিয়েছে। এই রকম কত কী যে বলে যাচ্ছিলেন তার ঠিক নেই।"

"শুধু বাগান নিয়েই বলছিলেন?" অনিল জিজ্ঞেস করল।

"তা বলা যায়। বাগান পুড়ে যাচ্ছে, মাটি গলে যাচ্ছে, ছারখার হয়ে গেল সব—এই রকম বলতে-বলতে ভয়ে চিৎকার করে উঠছিলেন।"

গোরা অনিলকে বলল, "ব্যাপারটা বাগান নিয়েই মনে হচ্ছে!"

অনিল মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ।...জুড়ন তোকে কী বলেছে?"

"বাগানের কথাই বলেছে। তবে জুড়ন বলছিল, মতিকাকা নাকি মানুষজনও দেখেছেন।"

অমর বলল, "বলেছেন হয়তো, তবে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। জুড়ন আবার ভিতু গোছের। তার কথা, বাবুকে ভূতে ভর করেছে। ওর কথা বাদ দাও, ও খানিকটা রঙ চড়িয়ে বলেছে তোমাদের কাছে। আমি তোমাদের বলছি, বাবু প্রথম দু' দিন ভুলভাল বলেছেন, বিকার বকেছেন। তাঁর শরীর খুব খারাপ গিয়েছে। খাওয়া-দাওয়া করেননি, ঘুম ছিল না। বাবু একটা ভয় পেয়েছেন। কিসের ভয়, তা বাপু আমি জানি না। এই দু' দিন উনি অনেকটা ভাল আছেন। তবে বারবার বলছেন, এই বাগান আর রাখবেন না। নষ্ট করে দেবেন।"

অনিল আর গোরা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

গোরা বলল, "এই বাগান নষ্ট করার কথা সেই ঘটনার পর মাথায় এল, না, আগেই এসেছে?"

"আগে? না, একবারও নয়। বরং বাবু মাঝে বলছিলেন, বাগান আরও খানিকটা বাড়াবেন। এবারে গোলাপ-চাষ এখনও পর্যন্ত ভাল হয়নি। পুজোর পর আট-দশ দিন হঠাৎ বৃষ্টি নামল জোরে, মাটি আরও ভিজে গেল, শুকোতে পেল না। বোধহয় গোলাপের ক্ষতিই হয়েছিল বৃষ্টিতে। তবে এখন রোদে মাটি টানছে। মাঘের দিকে ফুল ভাল হবে।"

অনিল বলল, "তোমরা বাগানের কোনো অদলবদল দেখেছ?"

"অদলবদল? না। যেমন বাগান তেমনই আছে।"

"ওই যে পুলিনবাবু, তোমাদের ডাক্তার, উনি কী বলেছেন?"

"ওঁর কথা বাদ দাও। একবার বলেন মৃগী, একবার বলেন পক্ষাঘাত, আবার বলেন মাথার গোলমাল।"

গোরা হাত তুলে প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিল। অনিলকে বলল, "চল্, একবার বাগানে যাই।"

অনিল পা বাড়াল।

বাগানের দিকে যেতে-যেতে গোরা বলল, "ব্যাপারটা বাগান নিয়ে। তুই কী বুঝছিস?"

"কিছুই বুঝছি না ভাই। আমার তো মাথায় আসছে না—মতিকাকা কেমন করে দু' দুটো বাগান দেখছেন, তাও একটার মাথায় অন্যটা। দ্বিতীয় বাগানটা কি শূন্যে ঝুলছে? আর গোলাপগাছ বেড়ে তালগাছের মতন লম্বা হয়ে গেছে—এটাই বা উনি কেমন করে দেখেন। চোখের দোষ, মানে চোখের কোনো ব্যাধি হল, না মাথার, কে জানে।"

গোরা বলল, "বাগানের ওপর হঠাৎ এত রাগই বা কেন হল কাকার যে, বাগান পুড়িয়ে নষ্ট করে দেবেন বলছেন?"

"আমার মাথায় ঢুকছে না।"

"দেখি, কাকা কী বলেন। তাঁর মুখ থেকে ব্যাপারটা শুনি। যদি কিছু বুঝতে পারি।"

অনিল কোনো কথা বলল না।

॥ পাঁচ ॥

বিকেলের দিকে মতিলাল নিজেই ডাকলেন গোরাদের। তখনও আলো মরে যায়নি, ফিকে ও নিস্তেজ হয়ে এসেছে।

অনিলরা স্নান-খাওয়া সেরে সেই যে গায়ে কম্বল চাপিয়ে ঘুম দিয়েছিল, উঠল বিকেল পড়ার মুখে। গা জুড়ে আলস্য,

হাই উঠছিল। শীতের দিন বেলা পড়ে যাবার পর যেন ঠাণ্ডা আরও জড়িয়ে ধরে।চোখ-মুখ ধুয়ে দু' জনেই মতিলালের ঘরে হাজির হল।

মতিলাল বললেন, "চা খেয়েছ?"

মাথা নাড়ল গোরা।

"চা আনছে।...বোসো।"

বসল দু'জনে। মতিলালের ঘরটি বড়। শোওয়া-বসার ব্যবস্থা ছাড়াও নানান ছোটখাটো আসবাবে ঘরটি ঠাসা। জিনিসপত্র রয়েছে বিভিন্ন ধরনের। বইয়ের একটা আলমারিও একপাশে। আলমারির ভেতরে, মাথায় গুচ্ছের বই এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে।

মতিলাল বললেন, "তোমরা চা খেয়ে নাও, তোমাদের নিয়ে বাগানে যাব।" বলে একটু থেমে আবার বললেন, "আমি যা দেখেছি, তোমরা যে আজ সেই দৃশ্য আবার দেখবে, আমার মনে হয় না। আমি গতকালও একবার গিয়েছিলাম, দেখতে পাইনি। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, আবার একদিন ওই দৃশ্য দেখব না। কিংবা অমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটবে না।"

অনিলরা কথা বলল না। মতিকাকার মুখ থেকেই সব শোনা ভাল। যতক্ষণ না শোনা যায়, ততক্ষণ চুপ করে থাকাই ভাল।

চা নিয়ে এল ঠাকুর।

মতিলাল তাগাদা দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। বিকেল ফুরিয়ে গেলে চলবে না। যে-সময় ঘটনাটা আমি ঘটতে দেখেছি, সেই সময়ে তোমাদের ওখানে নিয়ে যেতে চাই। আমি কিন্তু তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, আমার গোলাপবাগান এখন বিপদের ব্যাপার হয়ে রয়েছে। তোমরা যদি না-চাও, যেও না।"

অনিল বলল, "আমরা যাব। বিপদ আমাদের গিলে ফেলবে না। আপনারা সবাই রয়েছেন এখানে। বিপদ তো আপনাদেরও।"

"বেশ। তা হলে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নাও।"

অনিলরা যত তাড়াতাড়ি পারে চা শেষ করল। প্যান্ট শার্ট পুলওভার তারা আগেই পরে নিয়েছে, যা শীত।

অনিল আর গোরাকে নিয়ে মতিলাল বাগানে চললেন।

তখন আর বাগানে রোদ বলে কিছু নেই। খুব পাতলা এক আলোর রেশ আকাশের তলায় ছড়িয়ে রয়েছে। গোধূলিবেলার মতন লাগছিল। কনকনে বাতাস দিচ্ছে উত্তর থেকে।

মতিলাল বাগানের পশ্চিম দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর পাশেই এক জলের চৌবাচ্চা। সামনে গোলাপঝাড়।

মতিলাল একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "সেদিন মোটামুটি এইরকম সময় আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি...ওই যে গোলাপগাছটা দেখছ...ওই যে লাল গোলাপগাছটা ...ওই গাছের কয়েকটা ডাল ছেঁটে দেবার জন্যে কাঁচি হাতে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, ডালগুলো আজই ছাঁটব, না আরও একটু বাড়লে ছাঁটব। এমন সময় আমার মনে হল, হাওয়ার ঝাপটায় যেন গা কেমন দুলে উঠল। বুঝতেই পারছ, এখন শীতের বাতাস কনকন করে ছোটে। যেমন আজ ছুটছে। কিন্তু এই হাওয়া তো ঝড় নয় যে, আমায় ঠেলে ফেলে দেবে!...আমি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আবার যখন গোলাপগাছটার দিকে তাকিয়েছি...দেখি ওই গাছের মাথার ওপর কেমন এক ফিকে নীলচে আভা। আমি যদিও বলছি ফিকে নীলচে আভা, তবু রঙটা যে ঠিক কেমন তা বোঝাতে পারব না। উনুনের আঁচ ওঠার পর যেমন আগুনের একটা গনগনে ভাব উনুনের ওপর দেখা যায়, প্রায় ওই ধরনের খুব ফিকে এক আভা গোলাপগাছের মাথায়। তারপর দেখি, সেই আভার ওপর একটা গাছ ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অবিকল ওই গোলাপগাছটার মতন। চোখের ভুল ভেবে আমি এপাশ-ওপাশ তাকালাম। তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। এপাশ-ওপাশের গাছগুলোর মাথার ওপরেও অবিকল সেই একই রকম দৃশ্য। দেখতে-দেখতে এই বাগানের মাথার ওপর আর-একটা বাগান...ঠিক এইরকম, অবিকল এই রকম বাগান ভাসতে থাকল। গোটা বাগান কি না, তা আমি বলতে পারব না, কেননা তখন আমার এমন অবস্থা যে, চারদিকে তাকিয়ে কী দেখেছি, তা আমার খেয়াল নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, বাগানের অনেকটাই শূন্যে ভাসছিল।"

গোরা আর অনিল মতিকাকার কথা শুনছিল অবাক হয়ে। তাদের চোখের পলক পড়ছিল না।

মতিলাল যেন দম নিলেন সামান্য। তারপর বললেন, "চোখের ভুল ভেবে আমি প্রথমটায় ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তার পরেই দেখি, গোলাপগাছগুলো মাথার দিকে বেড়ে যাচ্ছে, লম্বা হয়ে যাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি এমন অদ্ভুতভাবে সেগুলো লম্বা হতে লাগল যে, মনে হল এগুলো আকাশের দিকে উঠে যাবে। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমার শরীরের মধ্যেও কেমন-কেমন করতে লাগল। একরাশ কুয়াশা যেন ভেসে আসতে লাগল চারদিক থেকে। আমি ভয়ে চিৎকার করেছিলাম কিনা মনে নেই। তখনই হয়তো অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাই।"

মতিলাল থেমে গেলেন।

অনিলরা কিছুক্ষণ মতিলালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বাগানের দিকে তাকাল। মতিকাকা যা বললেন, তা বিশ্বাস করা যায় না, তারা কোনো হেরফের দেখছে না বাগানের।

অনিল বলল, "আপনি এ-রকম ঘটনা আর ঘটতে দেখেছেন? মানে এই বাগানে আর ঘটেছে?"

মাথা নাড়লেন মতিলাল। "না। আগে এমন দৃশ্য আমি দেখিনি। শরীরটা সামলে নিয়ে আমি গতকালও একবার এই সময় এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কিছুই চোখে পড়েনি। যা দেখেছি, ওই একদিনই।"

গোরা বলল, "আপনি সেদিন অসুস্থ ছিলেন না তো?"

"না। একেবারেই নয়। পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিলাম। বরং তোমাদের বলি, ওই দৃশ্য যখন দেখছিলাম, তখন আমার শরীরের মধ্যে ভীষণ এক কষ্ট হচ্ছিল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, শরীরের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে যাবার মতন লাগছিল; মাথা ভার, অবশ হয়ে আসছিল। সোজা কথায় আমার শরীরের মধ্যে একটা অদ্ভুত কিছু ঘটে যাচ্ছিল।"

বিকেলের আলো পালিয়ে গেল। ছায়ামেশানো অন্ধকার নামছে। অনিল একবার আকাশের দিকে তাকাল। চোখ নামিয়ে বলল, "আপনার শরীর এখন ভাল?"

"কাল থেকে অনেকটাই ভাল। তার আগের দু' দিন আমি

আমাতে ছিলাম না।"

গোরা বলল, "এখন কি আপনি পুরোপুরি সুস্থ?"

"না। ভেতরে দুর্বলতা রয়েছে। মাঝে-মাঝে হাত-পা কেঁপে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টিটাও থেকে-থেকে ঝাপসা হয়ে আসছে।"

মতিলাল আর বাগানে দাঁড়াতে চাইলেন না, বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। গোরারাও ওঁর পেছন পেছন চলল।

"এ-রকম কেন হল, আপনি কিছু বুঝতে পারছেন?" অনিল জিজ্ঞেস করল।

মতিলাল মাথা নাড়লেন। "না। বুঝতে পারলে তো স্বস্তি পেতাম। আমি কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। তবে চেষ্টা করছি।"

"চোখের ভুল বা শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে যাবার জন্যে নয়?"

"না না, একেবারেই তা নয়। নিতান্ত চোখের ভুল অতক্ষণ থাকতে পারে না। নিমেষের জন্যে চোখের ভুল হয়। আমি যা দেখেছি তা দু' এক পলকের ব্যাপার নয়।"

"কতক্ষণ দেখেছেন?"

"বলতে পারব না। সময়ের হিসেব থাকে না তখন। তবে পাঁচ-সাত মিনিট নিশ্চয়।"

"আর কেউ দেখেনি? গোবিন্দমালী তো কাছেই ছিল।"

"গোবিন্দ একেবারে কাছে ছিল না। সে খানিকটা তফাতেই ছিল। মাটিতে বসে সার মেশাচ্ছিল। তার নজর ছিল না।"

"গোবিন্দরও কি শরীর খারাপ হয়েছিল?"

"খানিকটা হয়েছিল। কম। তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। বমিও করেছে। পরে সামলে নিয়েছে।"

অনিলরা আর কিছু বলল না।

॥ ৬ ॥

মতিকাকার কাছে দুটো দিন কাটল অনিলদের। এই দু'দিনে নতুন কিছু ঘটেনি। একটা জিনিস তারা লক্ষ করছিল। প্রথম এসে মতিকাকাকে যত বিচলিত দেখেছিল, বা তাঁর শরীর যতটা খারাপ দেখেছিল, এখন যেন তার চেয়ে কম দেখাচ্ছে। বোধহয়, নিজেকে সামলে নিয়েছেন অনেকটা। এমনও হতে পারে অনিলরা কাছে থাকায় তিনি সাহসও পাচ্ছেন কিছুটা। রোজই বাগান নিয়ে কথা বলেন, আলোচনা করেন, কেন অমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল—তা নিয়ে মাথা ঘামান। তবে একটা বিষয় মতিকাকা প্রায় মনঃস্থির করে ফেলেছেন। এই বাগান আর তিনি রাখবেন না। নষ্ট করে ফেলবেন।

মতিকাকার বাগানের লোকরা বেশ মনমরা হয়ে পড়েছে। বাগান যদি নষ্ট করে ফেলা হয়, তাদের কী গতি হবে! তাদের ধারণা, বাবু যা দেখেছেন, ভুল দেখেছেন। একবার ভুল করে কী দেখেছেন, তার জন্যে এমন বাগান কেউ নষ্ট করে! কত পরিশ্রম করে তৈরি করা হয়েছে এই গোলাপবাগান। অমর বলছিল, "তোমরা বাবুকে বুঝিয়ে বলো, এ একেবারে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা হচ্ছে। আমরা এতগুলো লোক বহাল তবিয়তে আছি, বাবুই শুধু ভয় পাচ্ছেন।"

সেদিন সন্ধেবেলায় মতিকাকার ঘরে বসে গোরারা কথা বলছিল। কথায়-কথায় অনিল বলল, "আপনি এত তাড়াতাড়ি বাগান নষ্ট করবেন না, কাকাবাবু।"

মতিলাল তাকালেন, কথা বললেন না।

অনিল বলল, "যা ঘটেছে, একবারই ঘটেছে। আবার যদি ঘটে তখন না হয়..."

"আবার ঘটবে এমন কথা নেই," মতিলাল বললেন, "ঘটবে কি না-ঘটবে তা নিয়েও আমি ভাবছি না, আমি ভাবছি—পরিণাম।"

গোরা আর অনিল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মতিলাল বললেন, "আজ ক'দিন আমি অনবরত ভাবছি। ভাবছি আর ভাবছি।" বলে তিনি আঙুল দিয়ে কয়েকটা বইপত্র দেখালেন। বললেন, "তোমরা জানো, আমার নানা ধরনের বই পড়ার অভ্যেস আছে। পেশায় আমি কেমিস্ট ছিলাম। সে পেশা ছেড়েছি অনেক কাল আগে। তবে বইপত্র ঘাঁটি নানা জাতের। আমি যা দেখেছি, তার একটা মাত্র যুক্তি আমি খাড়া করতে পেরেছি। সে-যুক্তি নড়বড়ে, ধোপে টিকবে কিনা জানি না।"

অনিলরা কৌতূহল অনুভব করল। কাকা যে কোনো যুক্তি খাড়া করতে পেরেছেন, তারা জানত না। উনি কিছু বলেননি।

গোরা বলল, "কী যুক্তি?"

মতিলাল বললেন, "কতকগুলো জিনিস আছে, আদি জিনিস, যার ভালমতন জবাব আজও দেওয়া মুশকিল। ওপর-ওপর তার জবাব আছে, খুঁটিয়ে দেখলে রহস্যময় মনে হয়। যেমন মাধ্যাকর্ষণ বা গ্রাভিটি। মাধ্যাকর্ষণের মূল রহস্যটাই আমরা এখনও জানতে পারিনি। এই রকম আর এক রহস্য হল—ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এর সম্পর্কে প্রত্যেকটি প্রশ্নের খুঁটিনাটি জবাব হয় বলে অনেকেই মানেন না।"

অনিল বলল, "এই বাগানের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী?"

"বোধহয় আছে। আমার যা মনে হয়েছে, বলছি। আমি কখনও বলব না, আমি যা বলছি তা সত্যি। আমি আমার অনুমানের কথা বলছি।"

গোরা মাথা হেলাল, "বলুন।"

"এই বাগানটার কথা এবং যে-সময়ে আমি ওই অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি তার কথা এবার ভাবো। তখন পড়ন্ত বিকেল, মানে বিকেল শেষ হয়েছে প্রায়, আকাশে ফিকে আলো রয়েছে শীতের। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম একটা জলভরা বড় চৌবাচ্চার কাছে। আমার সামনে গোলাপগাছের ঝাড়। বুঝতে পারছ?"

"পারছি।"

"ধরো, যদি এমন হয়...আমি যখন গোলাপগাছগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ঠিক তখন ওখানে আচমকা একটা ইন্‌টেন্‌স ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছিল। তোমরা কি জানো, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটেনসিফায়েড হলে অনেক কিছু হতে পারে।"

"না," অনিল মাথা নাড়ল। "ম্যাগনেটিক ফিল্ড জানি। ইন্‌টেন্‌স ম্যাগনেটিক ফিল্ড জানি না।"

"ব্যাপারটা তো তোমাদের বোঝানো যাবে না। তবু বলি, ম্যাগনেটিক ফিল্ড, বা চৌম্বকক্ষেত্র—যদি সাধারণ বা স্বাভাবিকের বেশি হয়ে ওঠে তাকে ইন্‌টেন্‌স বলতে পারো। অবশ্য এই ইন্‌টেনসেরও মাত্রা আছে। যেমন গরমের থাকে, উনুনের তাত আর চুল্লির তাত ভেবে নাও।"

"এটা কেমন করে হয়? মানে ইন্‌টেন্‌স ম্যাগনেটিক

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা.৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2668 BEN

ফিল্ড ?"

"জানি না। আমি জানি না। বিজ্ঞানীরা কলাকৌশল করে করতে পারেন পড়েছি। আবার প্রকৃতির খেয়ালেও হয়। ম্যাগনেট্ কথাটা শুনতে সহজ, কিন্তু এই প্রাকৃতিক শক্তিটির অনেক বিষয় আমরা আজও জানি না। এটি একটি রহস্যময় শক্তি।"

অনিল বলল, "আপনি যা চোখে দেখেছেন, তার সঙ্গে ওই ফিল্ডের সম্পর্ক কী ?"

"বলছি। তার আগে বলি, তোমরা মরীচিকা বা মিরাজ কেন হয় জানো ?"

"মরুভূমিতে হয়।"

"শুধু মরুভূমিতে নয়, পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে তাকালেও দেখা যায় ; সমুদ্রেও হয়। কেন হয় ?"

"মরুভূমিতে হয় তেতে ওঠা বালির জন্যে।"

"হ্যাঁ—তবে সবটা বললে না। মিরাজ বা মরীচিকা হল প্রকৃতির একটা ট্রিক বা চালাকি। আবহাওয়ার মধ্যে কতকগুলো ব্যাপার থাকা দরকার ; না থাকলে মিরাজ হয় না। প্রথমেই ধরো, আমরা যা দেখি, যে-কোনো জিনিস, তা দেখা সম্ভব হত না, যদি না সেই জিনিস থেকে আলোর রশ্মি প্রতিফলিত হত, হয়ে আমাদের চোখে এসে পৌঁছত। এখন এই আলোর রশ্মি আমাদের চোখে কেমন করে আসে ? সাধারণত স্ট্রেট লাইনে।"

অনিল ঘাড় নাড়ল। "মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা যায়—দিনের বেলার উত্তপ্ত বালির জন্যে।"

"হ্যাঁ, বালি অসম্ভব গরম হয়ে ওঠার জন্যে নীচের দিকে···মানে মাটিই বলো এখানে···বাতাস তপ্ত হয়ে থাকে। এই গরম বাতাসের স্তর একরকম আয়নার মতন কাজ করে। এখন কী হয় জানো ? অনেক দূরের···দিগন্তের কোনো অবজেক্টের আলো এসে এই 'আয়নার' ওপরে পড়ে···সেই জিনিসটার ছবি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে ধরা দেয়। আসলে বলতে পারো, গরম বাতাস আয়নার মতন কাজ করছে বলেই এই মিরাজ। আলোর রেখাও কিন্তু গরম বাতাসে বেঁকে যায়।"

গোরা কেমন অবাক হয়ে মতিকাকাকে দেখছিল। তার মাথায় ঢুকছিল না—কাকা মিরাজের কথা কেন তুলেছেন।

মতিলাল বললেন, "মরুভূমির কথা থাক। এবার সমুদ্রের কথা বলি। সমুদ্রেও মরীচিকা দেখা যায় ; মিরাজ। সমুদ্রের বেলায় অবস্থা পালটে যায়। জলের ওপরকার বাতাস ঠাণ্ডা, যত ওপরে ওঠা যাবে—বাতাস তত গরম। দূরের কোনো জাহাজের গা থেকে আলোর ঢেউ এসে সেই গরম বাতাসে লাগলে তার যে প্রতিফলিত ছবি আমরা চোখে দেখব, তা কিন্তু জলে দেখব না, দেখব শূন্যে।"

অনিল বলল, "আপনি কি তাই দেখেছিলেন ?"

মতিলাল যেন হাসবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "একটা অদ্ভুত কথা বলি তোমাদের। সিসিলির নাম শুনেছ নিশ্চয়, ইটালি···সিসিলি। সেই সিসিলিতে স্ট্রেট অব মেসিনাতে এইরকম এক জগৎ-বিখ্যাত মিরাজ দেখা যায়। পুরো মেসিনা শহরটাকে আকাশে ঝুলছে দেখা যায়। ইটালিয়ানরা একে বলে *Fata Morgana*। আগেকার লোকরা ভাবত, মরগান লে ফে বলে একজন অপদেবতা এই কাণ্ডটি করেছিল। অবশ্য আজ সবাই জানে, ওটা অপদেবতার কাজ নয়, প্রকৃতির চালাকি।"

গোরা বলল, "আপনার বেলাতে একই কাণ্ড ঘটেছে ?"

মতিলাল মাথা দোলালেন। "আমার তাই অনুমান। যুক্তি হিসেবে আমার মাথায় আর কিছু আসছে না।"

"আপনি যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কথা বলছিলেন ?"

"হ্যাঁ। ঘটনাটা এইভাবে ঘটেছে বলে আমার ধারণা," মতিলাল বললেন, "সেদিন, যে-কোনো কারণেই হোক, ওই জায়গায়···আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার আশেপাশে একটা ইন্‌টেন্‌স ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছিল। আর ওই একমাত্র কারণে বাতাস অস্বাভাবিক গরম হয়ে উঠেছিল। বাগানের মাটির দিকটা ছিল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, ওপরের দিকে যত স্তর ছিল—বায়ুস্তর—সেগুলো ভীষণ গরম হয়ে উঠেছিল। তপ্ত সেই বায়ুস্তর আয়নার মতন কাজ করছিল। যার ফলে আমি একটা মিরাজ দেখেছি। আর বাগানের ছবিটা যে আসল বাগানের মাথার ওপর দেখেছি, তার কারণও ওই, ওপরের দিকেই মিরাজ হয়েছে। অবশ্য যে-মিরাজ আমি দেখেছি, সেটা সোজা ছিল। এ-ক্ষেত্রে হওয়া উচিত ছিল উলটো। সোজা কেন হল, তার জবাব আমার জানা নেই। বোধহয় ইন্‌টেন্‌স ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্যে।"

"আপনার শরীর অসুস্থ হল কেন ?"

"আমি সেই ইনটেন্‌স্ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে ছিলাম। আরও বেশি খারাপ হতে পারত। হয়নি, এ আমার সৌভাগ্য।"

"গোবিন্দ মালীর বেলায় কিছু হল না কেন ?"

"গোবিন্দ আমার গায়ের কাছে ছিল না। সে খানিকটা তফাতে ছিল। ধরো চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ। মাটিতে বসে-বসে সার মিশিয়ে তৈরি করে রাখছিল। সে মুখ তুলে তখন তাকায়নি। সে ঠাণ্ডার মধ্যে ছিল। পরে যখন সে উঠে আমার কাছে আসে, তখন বোধহয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড হালকা হয়ে যাচ্ছিল। তবু তার শরীর খারাপ হয়েছে।"

গোরা আর অনিল চুপ করে থাকল। তারা বোধহয় তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি ভাল করে।

অনিল বলল, "আপনি যা বলছেন, এটাই একমাত্র যুক্তি ?"

"না, না। আমি বারবার বলেছি, আমার বুদ্ধিমতে যতটা পেরেছি, একটা কারণ বার করার চেষ্টা করেছি। আমার যুক্তি ভুল হতে পারে।"

"তা যদি হয়, মরীচিকাই হয়, আপনি এই বাগান নষ্ট করতে চাইছেন কেন ?"

"চাইছি একটা মাত্র কারণে। ···যে যাই বলুক, এই বাগানের কোথায় কী ঘটে গিয়েছে আমরা জানি না। যদি কোনো ক্ষতি হয় ভবিষ্যতে, আমি তো কিছু করতে পারব না।"

"তেমন ক্ষতি হতে পারে ?"

"পারে, নাও পারে। কেমন করে বলব ?"

"এরা যে বাগান নষ্ট করতে দিতে চাইছে না ?"

"আমিও কি চাই ! আমার নিজের হাতে গড়া গোলাপবাগান। কিন্তু কী করব, বাবা ! ···দেখি, আরও ক'দিন ভেবে দেখি।"

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

দার্জিলিং আর পাহাড়তলির বাছাই করা ফল থেকে–জিভে জল আসা জ্যাম, জেলী, মার্মালেড, স্কোয়াশ, সস্, টিনেভর্ত্তি জুস্, আনারসের মিষ্টি চাকা আর টিট্‌বিট্‌স্।

Kanchan

Darjeeling Fruit & Vegetable

Mileage/K-2

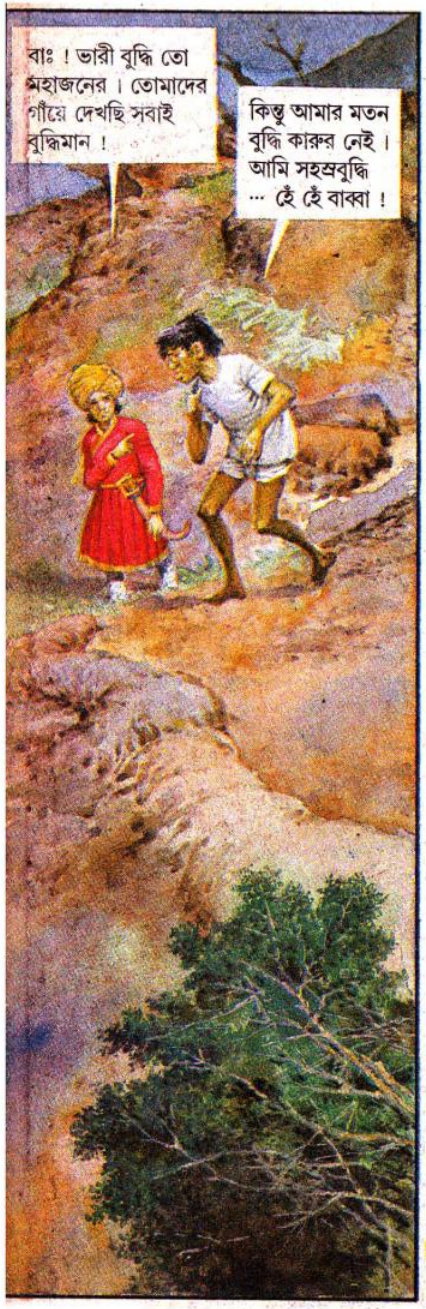

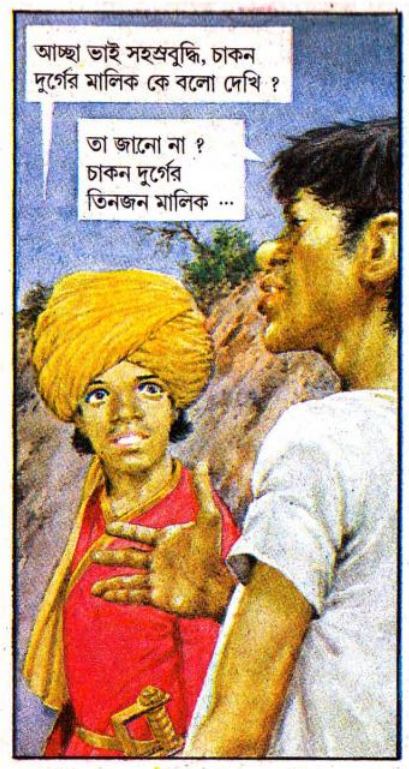

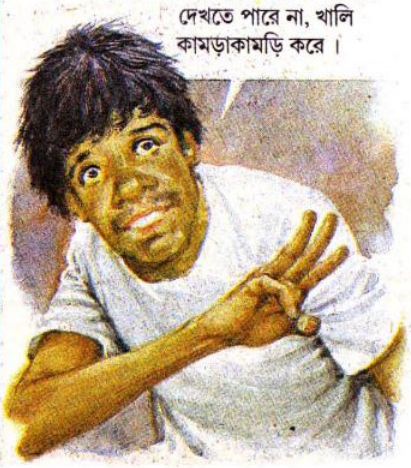

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

সাধু কি রাজাকে অপমান করেছেন ?

বুদ্ধির পরীক্ষা

জীবরাম যোশি

অনেকদিন আগের কথা। বুদ্ধিপ্রিয় তখন উজ্জয়িনীর রাজা। এক মস্ত বড় সাধু নানা দেশ ঘুরতে-ঘুরতে একদিন উজ্জয়িনী রাজ্যে এসে হাজির হলেন। নগরের মানুষ সাধুকে তাদের মধ্যে পেয়ে খুব খুশি। বেশ ধুমধাম করে নগরের মধ্যিখানে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠা করা হল।

রাজা বুদ্ধিপ্রিয়র কানে গেল কথাটা। একে সাধু, তার উপর তিনি নাকি মহা তেজস্বী। কাজেই তাঁর সঙ্গে একটু দেখা হওয়া দরকার। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। রাজামশাই দেখা করলেন সাধুবাবার সঙ্গে। তাঁকে বিস্তর ফলমূল উপহার দিয়ে বললেন, "আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, সাধুজি। আমি এই নগরের রাজা, বুদ্ধিপ্রিয়।"

"তুমি রাজা! বেশ, বেশ। তাহলে সেপাই হয়ে যাও।" সাধু এই কথা ক'টি বলে চুপ করে গেলেন।

সাধুর মুখে এ কী কথা শুনলেন বুদ্ধিপ্রিয়! ভারী চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। সাধু কি তাঁকে অভিশাপ দিলেন, না আশীর্বাদ জানালেন? মাথা হেঁট করে রাজামশাই ফিরে গেলেন তাঁর প্রাসাদে। কিছুই তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না।

বুদ্ধিপ্রিয় তাঁর দরবারে নগরের নামী বিদ্বান-বুদ্ধিমানদের নিয়ে এক 'চতুর-সভা' তৈরি করেছিলেন। সেই সভার যিনি প্রধান পণ্ডিত, রাজার মুখে সব কথা শুনে তিনি তো খুব চটে গেলেন। এ আবার কীরকম সাধু! একবার দেখে আসতে হয়!

তিনিও ছুটলেন সাধুর কাছে। প্রণাম করে পণ্ডিত বললেন, "আমি এই নগরের চতুর-সভার প্রধান পণ্ডিত।"

"তাই নাকি, তাই নাকি," মৃদু হাসলেন সাধুবাবা, "তুমি তাহলে অ-জ্ঞানী হয়ে যাও।"

পণ্ডিত বিষম চটে গেলেন সাধুর কথায়। এসব কথার মানে কী? আমি হলাম নগরের প্রধান পণ্ডিত, আর আমি কিনা অ-জ্ঞানী অর্থাৎ মূর্খ হয়ে যাব! রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে তিনিও সেখান থেকে ফিরে গেলেন।

সব শুনেটুনে নগর-শেঠ ভাবলেন, এ তো যেমন-তেমন সাধু নয়। এর কেরামতি একবার দেখা দরকার। একজোড়া খড়ম আর একটি রেশমের চাদর নিয়ে নগর-শেঠ গিয়ে দেখা করলেন সাধুবাবার সঙ্গে। প্রণাম করে পরিচয় দিলেন নিজের, "আমি উজ্জয়িনীর নগর-শেঠ।"

"খুব ভাল, খুব ভাল," হাসলেন সাধুবাবা, "তুমি তাহলে সেবক হয়ে যাও।"

রাগে-ক্ষোভে মুখ লাল হয়ে উঠল নগর-শেঠের। তিনি আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালেন না।

নগরের এক প্রান্তে থাকে এক হরিজন। এই সব কথা তারও কানে গেল। সাধুবাবাকে দেখবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু কীভাবে সে সাধুবাবার কাছে যাবে! সে যে

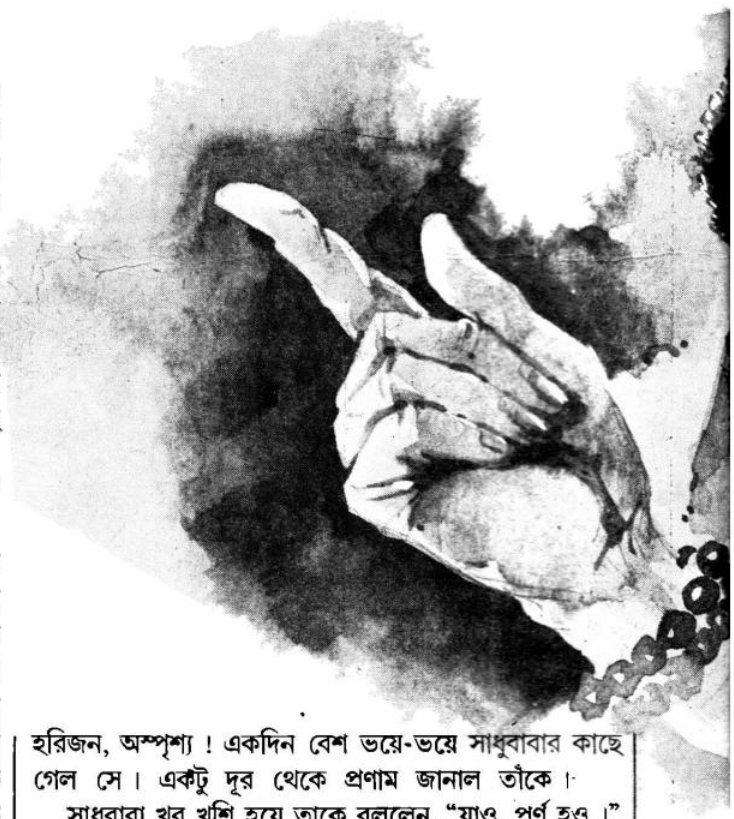

হরিজন, অস্পৃশ্য! একদিন বেশ ভয়ে-ভয়ে সাধুবাবার কাছে গেল সে। একটু দূর থেকে প্রণাম জানাল তাঁকে।

সাধুবাবা খুব খুশি হয়ে তাকে বললেন, "যাও, পূর্ণ হও।"

সাধুবাবার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মুখে-মুখে এই আলোচনা। রাজসভা ডাকা হল। সিংহাসনে বসে আছেন রাজা বুদ্ধিপ্রিয়। তাঁর মনে আনন্দ নেই।

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড। কাল এক হরিজন সাধুবাবাকে প্রণাম করে এসেছে। সাধুবাবা ভারী খুশি হয়ে তাকে 'পূর্ণ হও' বলে আশীর্বাদ করেছেন।"

নগর-শেঠ মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "সাধু আমাকে সেবক হয়ে যেতে বলেছেন মহারাজ।"

"আর আমাকে বলেছেন অ-জ্ঞানী হও," চতুর-সভার প্রধান পণ্ডিত ক্ষোভে ফেটে পড়লেন, "এ তো ঘোর অন্যায়, মহারাজ, ঘোর অন্যায়।"

"ঠিক কথা, ঠিক কথা," মাথা নেড়ে সায় দিলেন রাজামশাই, "সাধুবাবা আমাকে বলেছেন সেপাই হয়ে যেতে। এসব তো মোটেই ভাল কথা নয়।"

প্রধান-পণ্ডিত বললেন, "একটা অস্পৃশ্য হরিজন সাধুবাবার আশীর্বাদ পেল, আর আমাদের তিনি শাপশাপান্ত করলেন, এ কীরকম ন্যায় মহারাজ?"

রাজা প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়লেন, "ওই শয়তান সাধুকে এক্ষুনি কারাগারে নিক্ষেপ করো।"

রাজার আদেশ শোনামাত্র সেপাই-সান্ত্রিরা সাধুবাবাকে কারাগারে বন্দী করল।

সাধুবাবা বন্দী হলেন বটে, কিন্তু এখন ন্যায়বিচার তো দরকার। সেটা কীভাবে হবে? চতুর-সভার সব পণ্ডিতকে ডাকা হল। একজন পণ্ডিত বললেন, "সাধুবাবা রাজামশাইকে অপমান করেছেন।"

অন্য একজন পণ্ডিত বললেন, "শুধু অপমানই নয়, সাধু এমন কথাও বলেছেন যাতে রাজার ক্ষতি হয়।"

আর-এক পণ্ডিত বললেন, "তাহলে এর শাস্তি কী হওয়া উচিত?"

"মৃত্যু!" গর্জে উঠলেন প্রধান-পণ্ডিত।

সবাই মাথা নেড়ে প্রধান-পণ্ডিতের কথায় সায় দিলেন। রাজা বললেন, "আমি সাধুকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। তাঁকে এখানে এনে এই দণ্ডাজ্ঞার কথা শোনানো হোক।"

তৎক্ষণাৎ সাধুবাবাকে রাজ-দরবারে হাজির করা হল। রাজার আদেশের কথা শুনে হোহো করে হেসে উঠলেন সাধুবাবা।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "মৃত্যুর কথা শুনেও আপনি হাসছেন? এতটুকু ভয় নেই আপনার?"

সাধুবাবা বললেন, "ভয় পাওয়ার কী আছে? আপনারা আমার কথার অন্য অর্থ করেছেন।"

"তার মানে?"

"মানে, আমি যে আপনাকে সেপাই হতে বলেছি, সেটা অভিশাপ নয়, বরং একটা উপদেশ।"

"কী রকম? কী রকম?" ব্যগ্র হয়ে ওঠেন রাজা বুদ্ধিপ্রিয়

সাধুবাবা বললেন, "রাজার কাজ হল প্রজা এবং দেশকে রক্ষা করা। সেপাই বলতে আমি রক্ষক বুঝিয়েছি। আপনি যেন সৎ রক্ষক হতে পারেন, এই আশীর্বাদই আমি আপনাকে করেছিলাম।

"নগর-শেঠের অর্থ ধনী ব্যক্তি। ধনীদের ধর্ম শুধু ধনসম্পদ বাড়ানো নয়, সমাজের এবং গরিবের সেবা করা। তাই আমি আশীর্বাদ করেছিলাম, সেবক হও। পণ্ডিতমশাই খুব বিদ্বান ব্যক্তি। তাঁকেও এই রকম আশীর্বাদ করেছিলাম। বিদ্যা কী দেয়, শোনো। বিত্ত ও সম্মান, এই দুই-ই দেয়। আবার এই দুয়ের থেকে অহঙ্কারও আসতে পারে। অ-জ্ঞানী ব্যক্তির কোনো অহঙ্কার থাকে না। তাই পণ্ডিতমশাইকে অ-জ্ঞানী হতে বলেছিলাম। আমি আপনাদের বুদ্ধির পরীক্ষা করেছিলাম মাত্র।"

সাধুবাবার কথা শুনে সবাই চুপ করে যান। সাধুবাবা বলতে থাকেন, "আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি রাজামশাই।... সেই হরিজনকে আমি 'পূর্ণ হও' বলেছিলাম, তার মানে 'সর্বদা মনের আনন্দে থাকো'। শুকনো রুটি চিবিয়ে মণ্ডা-মিঠাই খাওয়ার আনন্দ পাওয়াটাই হচ্ছে আসল পূর্ণতা।"

রাজা বুদ্ধিপ্রিয় হাতজোড় করে বললেন, "ক্ষমা করুন সাধুবাবা, আপনার কথার মর্ম আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা সত্যিই নির্বোধ।"

সাধুবাবা বললেন, "আপনি নির্বোধ নন মহারাজা, বুদ্ধিমান। যে মানুষ নিজের ভুল বুঝতে পারে, তার চেয়ে বড় বুদ্ধিমান আর কেউ নেই।"

রাজা বুদ্ধিপ্রিয়র চোখ আনন্দে চিকচিক করে উঠল। সাধুবাবাকে ধন্য ধন্য করতে লাগল সবাই।

অনুবাদ : শৈলী ভার্মা

ছবি : অনুপ রায়

মাদ্রাজ টেস্টে পরাজয়

অশোক রায়

কলকাতায় খুন হয়েছিল ক্রিকেট, মাদ্রাজে খুন হল ভারত। শুরু দেখেই যদি দিন সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মায়, তাহলে বলতেই হবে, মাদ্রাজ টেস্টের আরম্ভ দেখেই বোঝা গিয়েছিল এই টেস্টে ভারতের ভাগ্যে অনেক দুর্ভোগ জমা আছে।

টস জিতে পারফেক্ট ব্যাটিং ট্র্যাকে প্রথম দিনেই মাত্র ২৭২ রানে ইনিংস শেষ করে ভারত কোণঠাসা হয়ে পড়ে শুরুতেই। একমাত্র মহিন্দরের সংযত ইনিংসটি (৭৮) ছাড়া আর কাউকেই নিল ফস্টারের স্পিড ও সুইংয়ের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাসী মনে হয়নি। কপিলদেব টেস্ট টিমে 'প্রত্যাবর্তন-পর্বটি' পালন করেন স্বভাবসিদ্ধ ঝোড়োগতির একটি ইনিংসের (৫৩) মাধ্যমে। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার, সানির ব্যাট এই ইনিংসেও রইল রানহীন। ভারতকে মধ্যবিত্তের কোঠায় বেঁধে রাখতে নিল ফস্টার জীবনের সেরা বোলিং করলেন।

প্রথম দিনে ভারতকে দ্রুত শেষ করে দেবার পর থেকেই এই ম্যাচের লাগাম হাতে নেয় ইংলিশ ব্যাটসম্যানরা।

ফাউলার (ডবল সেঞ্চুরি)

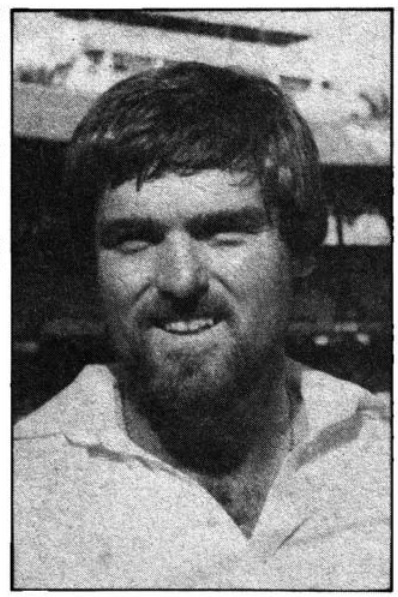

গ্যাটিং (ডবল সেঞ্চুরি)

ভারতীয় বোলারদের পেস-স্পিনের সুড়সুড়িতে প্রায় হাসতে হাসতে ইংরেজ ওপেনারদ্বয় বাঁ-হাতি ফাউলার এবং ডানহাতি রবিনসন প্রথম উইকেটে ১৭৮ রান যোগ করে ভারতের বিপক্ষে নতুন রেকর্ড গড়েন। প্রথম উইকেট যদি বা পড়ল, দ্বিতীয় উইকেটে ফাউলার (২০১) এবং মাইক গ্যাটিং (২০৭) জুড়লেন আরও ২৪১ রান। এটিও ভারতের বিপক্ষে রেকর্ড রান। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ দিনের সকালে ইংল্যাণ্ড যখন সাত উইকেটে ৬৫২ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করল, তখন রেকর্ড-বুক জানিয়ে দিল, ভারতের মাটিতে এর আগে আর কোনও দেশ এত বড় রানের ইনিংস গড়েনি। বলাবাহুল্য, ইংল্যাণ্ডের এই বিশাল রানের পেছনে রয়েছে ভারতীয় বোলারদের ভেদশক্তির অভাব এবং ফিল্ডারদের ব্যর্থতা।

নিল ফস্টার (এগারো উইকেট)

৩৮০ রানে পিছিয়ে ভারত শুরুতেই ঝাঁকুনি খায় বাইশ রানে গাওস্কর সহ তিন উইকেট হারিয়ে। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে রুখে দাঁড়ান বহু যুদ্ধের নায়ক মহিন্দর অমরনাথ এবং তরুণ আজহারউদ্দিন। মহিন্দরের একটি সামান্য ভুল মাত্র পাঁচ রানের জন্যে তাঁর বীরোচিত শতপূর্তির পথ রুখে দিল। তবে সেঞ্চুরি না পেলেও মহিন্দর দু-দফায় প্রমাণ করে দিলেন, এই মুহূর্তে পেস বোলিং খেলার ব্যাপারে তাঁর চেয়ে দক্ষ ব্যাটসম্যান ভারতবর্ষে আর কেউ নেই। তরুণ আজহার এই টেস্টেও অসাধারণ সেঞ্চুরি (১০৩) করলেন। অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরির ঠিক পরের টেস্টেই আবার সেঞ্চুরি করার রেকর্ড আর কোনও ভারতীয় ব্যাটসম্যানের দখলদারিতে নেই। পৃথিবীতে এমন কৃতিত্ব আর আছে কেবল বিল পন্সফোর্ড, ডাগ ওয়ালটার্স ও আলভিন কালিচরনের। মহিন্দর-আজহার যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন ততক্ষণ ভারতের ম্যাচ বাঁচানোর আশাটি জেগে ছিল। ওঁরা আউট হবার পরে ভারত ভেঙে পড়ে ৪১২ রানে, শেষ পর্বে কপিলদেব ও কিরমানির আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও। ভারত কোনওক্রমে ইনিংস পরাজয় রুখলেও ইংল্যাণ্ড জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় একটিমাত্র উইকেট খুইয়ে। ইংল্যাণ্ড এগিয়ে গেল ২-১ ফলাফলে। এবং এগিয়ে গেল চূড়ান্তভাবে সিরিজ জয়ের দিকেও।

ছয়ের ছড়াছড়ি

মণীশ মৌলিক

ওভারের প্রতিটি বল সীমানার বাইরে গিয়ে পড়ছে, এমন দৃশ্য প্রথম দেখা গিয়েছিল ১৯৬৮ সালে। ইংল্যাণ্ডে, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন ক্রিকেটের বিস্ময়পুরুষ স্যার গারফিল্ড সোবার্স। সকলে ভেবেছিল, এমন ধুন্ধুমার কাণ্ড বোধহয় আর কোথাও কখনও দেখা যাবে না। ষোলো বছর পরে ভারতের অল-রাউণ্ডার রবি শাস্ত্রী বোম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বাঁ-হাতি স্পিনার তিলকরাজের বলে পরপর ছটি ছয় মেরে প্রমাণ করলেন, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়।

স্পিনার তিলকরাজ নিশ্চয়ই ভাবতে পারেননি, তাঁর ওই ওভারটিতেই বিশ্ব-রেকর্ড স্পর্শ করতে যাচ্ছেন শাস্ত্রী। কেউ ভাবতে পারে না। এমনকি, যে স্পর্শ করে, সে-ও নয়। কিন্তু ক্রিকেট-নিয়তি আশ্চর্য খেলা খেলে।

স্যার গ্যারি অল-রাউণ্ডার ছিলেন, শাস্ত্রীও অল-রাউণ্ডার। নটিংহ্যামের হয়ে সোবার্স যাঁর বল মেরে ছাতু করেছিলেন তিনি ছিলেন গ্ল্যামরগানের ন্যাটা স্পিনার। বোম্বাইয়ের শাস্ত্রী মেরেছেন বরোদার বাঁ-হাতি স্পিনার তিলকরাজকে। গারফিল্ড সোবার্স রেকর্ড করেছিলেন ইংল্যাণ্ডের কাউণ্টি ক্রিকেটে। শাস্ত্রী করলেন রণজি ট্রফির খেলায়।

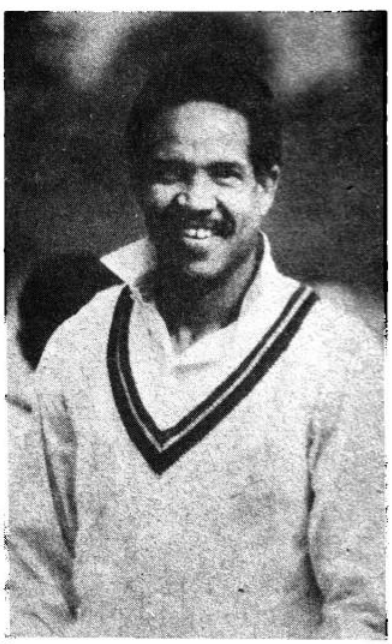

স্যার গারফিল্ড সোবার্স

তফাত দুটো জায়গায়। সোবার্স ব্যাট করতেন বাঁ-হাতে। শাস্ত্রী ডান-হাতি ব্যাটসম্যান। সোবার্সের ওই ইনিংসে আর-কোনও নতুন রেকর্ড তৈরি হয়নি। শাস্ত্রীর ইনিংসে তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি রেকর্ড।

প্রথম রেকর্ড, ১২৩ বলে ডবল সেঞ্চুরি, মাত্র ১১৩ মিনিটে। এই সময়ের মধ্যে দুশো রান করার ভাগ্য এর আগে আর কোনও ভারতীয় তো নয়ই, বিশ্বের কোনও ব্যাটসম্যানেরই হয়নি। সুতরাং এটি একটি বিশ্ব-রেকর্ড। এর আগে দ্রুততম ডবল সেঞ্চুরির কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন দুজন ব্যাটসম্যান—ইংল্যাণ্ডের সুখ্যাত মারকুটে গিলবার্ট জেসপ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্লাইভ লয়েড। এঁরা দুজনেই দুশো করতে সময় নিয়েছিলেন ১২০ মিনিট।

দ্বিতীয় রেকর্ড, একাত্তর মিনিটে প্রথম শতরান। এটা জাতীয় রেকর্ড। একচল্লিশ মিনিটে দ্বিতীয় শতরানও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ-ব্যাপারে বিশ্ব-রেকর্ড রয়েছে ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক পার্সি ফেণ্ডারের দখলে। তিনি সেঞ্চুরি করেছেন অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। সময় নিয়েছিলেন মাত্র ৩৫ মিনিট।

এই ইনিংসে তেরোটি ছয় মেরেছেন শাস্ত্রী। তেরোটি বাউণ্ডারিও। আর দুটি ছয় মারতে পারলে শাস্ত্রী আরও একটি বিশ্ব-রেকর্ডকে ছুঁয়ে ফেলতে পারতেন। নিউজিল্যাণ্ডের জন রিড ১৯৬২-৬৩ সালে ওয়েলিংটনের হয়ে, নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টসের বিরুদ্ধে ১৫টি ছয় মেরেছিলেন। কিন্তু ভারতে তেরোটি ছয় আর-কেউ মারতে পেরেছেন কি ? না, পারেননি। পুনশ্চ আর-একটি জাতীয় রেকর্ড।

কেমন করে ছটা ছয় মারলেন শাস্ত্রীজি, আমি জানি, তোমরা সেটা

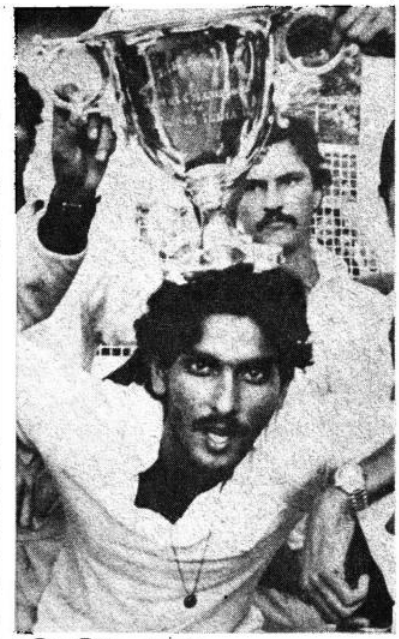

রবি শাস্ত্রী (নতুন মুকুট)

জানার জন্য ছটফট করছ। করছি তো আমিও। দুঃখের কথা, সে-সম্পর্কে কোনও বিস্তারিত খবর এ-লেখার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু সোয়ানসিতে স্যার গ্যারি যে তাণ্ডব করেছিলেন তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন ইংল্যাণ্ডের খ্যাতকীর্তি ক্রিকেটার ট্রেভর বেইলি। সোয়ানসি মাঠে, গ্ল্যামরগানের ম্যালকম ন্যাশের সেই বিখ্যাত ওভারের প্রথম তিনটি বল উড়ে গেল যথাক্রমে মিড অন, মিড উইকেট ও মিড অফের মাথার ওপর দিয়ে। চতুর্থ বল সজোরে পুল করলেন সোবার্স। স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে পড়ল বল। পঞ্চম বলে কট। না, কট আউট নন। ফিল্ডার ক্যাচ ধরেছেন সীমানার বাইরে গিয়ে। সুতরাং আবার ছয়। ন্যাশের ষষ্ঠ বল, শর্টপিচ। দিনের জঘন্যতম ব্যবহার পেল সেটা। দুর্দান্ত প্রহারে সেটা গিয়ে পড়ল সোয়ানসির চৌহদ্দিরই বাইরে। স্লিপে দাঁড়িয়ে ছিলেন পিটার ওয়াকার। শেষ বলে সোবার্সের মার দেখে তিনি একেবারে থ। বিস্মিত মুখে বলেছিলেন, ছয় নয়, ওটাতে বারো হয়েছে !

ভাবতেও ভাল লাগে, এখন থেকে এই রেকর্ডের ক্ষেত্রে অনন্য ক্রিকেটার গ্যারি সোবার্সের সঙ্গে আমাদের রবি শাস্ত্রীর নামও ক্রিকেট-বাইবেল উইজডেন এবং গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ লেখা হবে।

সেঞ্চুরি দিয়ে অভিষেক

নৃপতি চৌধুরী

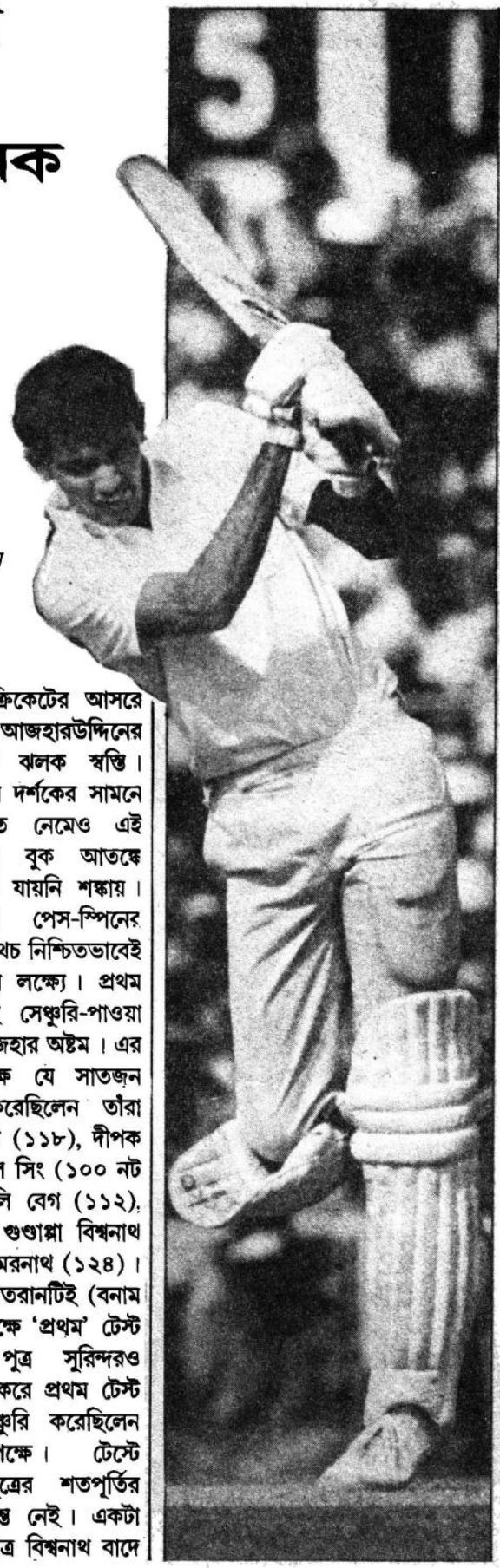

আজহারউদ্দিন

ইডেনের দমবন্ধ ক্রিকেটের আসরে একমাত্র মহম্মদ আজহারউদ্দিনের সেঞ্চুরিই ছিল এক ঝলক স্বস্তি। ইডেনের আশি হাজার দর্শকের সামনে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেও এই হায়দরাবাদী তরুণের বুক আতঙ্কে কাঁপেনি, সাহস উবে যায়নি শঙ্কায়। ইংরেজ বোলারদের পেস-স্পিনের ছোবল এড়িয়ে ধীর অথচ নিশ্চিতভাবেই সে পৌঁছয় শতরানের লক্ষ্যে। প্রথম টেস্ট খেলতে এসেই সেঞ্চুরি-পাওয়া ভারতীয়দের মধ্যে আজহার অষ্টম। এর আগে ভারতের পক্ষে যে সাতজন শুরুতেই সেঞ্চুরি করেছিলেন তাঁরা হলেন লালা অমরনাথ (১১৮), দীপক শোধন (১১০), কৃপাল সিং (১০০ নট আউট), আব্বাস আলি বেগ (১১২), হনুমন্ত সিং (১০৫), গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ (১৩৭) ও সুরিন্দর অমরনাথ (১২৪)। এঁদের মধ্যে লালার শতরানটিই (বনাম ইংল্যাণ্ড) ভারতের পক্ষে 'প্রথম' টেস্ট সেঞ্চুরি। লালার পুত্র সুরিন্দরও পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই সেঞ্চুরি করেছিলেন নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে। টেস্টে আবির্ভাবেই পিতা-পুত্রের শতপূর্তির গৌরবের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। একটা আশ্চর্য ব্যাপার, একমাত্র বিশ্বনাথ বাদে ভারতের পক্ষে যিনিই জীবনের প্রথম টেস্টে শতরান পেয়েছেন, তিনি আর কখনও টেস্ট ক্রিকেটে সেঞ্চুরির মুখদর্শন করেননি!

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে যে চোদ্দজন 'অভিষেক' টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন, তাঁদের মধ্যে চার্লস ব্যানারম্যানের অপরাজিত ১৬৫ (বনাম ইংল্যাণ্ড) রানের ইনিংসটিই সর্বাধিক। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ব্যানারম্যানের সেঞ্চুরিটি এসেছিল টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসের একেবারে 'পয়লা' ম্যাচেই। শুধু প্রথম সেঞ্চুরিই নয়, ব্যানারম্যানই প্রথম ব্যাটসম্যান, যিনি টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম বলটিও খেলেছিলেন। (এই সংখ্যা 'আনন্দমেলা'য় ৫৭ পৃষ্ঠায় তাঁর ছবি দেখে নাও।)

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে খেলতে নেমেই সেঞ্চুরি করেছেন এমন ব্যাটসম্যান ১৩ জন। প্রথম নামটি বলা বাহুল্য, 'ক্রিকেটের জনক' ডব্লু· জি· গ্রেস সাহেবের। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে যে দুই ভারতীয় এই গৌরবময় অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা হলেন রঞ্জিত সিংজি এবং ইফতিকার আলি পতৌদি। দুজনেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শুরুতেই শতরান করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের আর ফস্টারকে মনে রাখতে হবে এই কারণে যে, প্রথম টেস্টেই তাঁর চেয়ে বেশি রানের রেকর্ড (২৮৭) আর কারও ঝুলিতে নেই।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দশটি নামের মধ্যে আলাদাভাবে নজরে আসবেন লরেন্স রো। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রো জীবনের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসেই হাঁকিয়েছিলেন ডবল সেঞ্চুরি। এবং দ্বিতীয় ইনিংসেও তাঁর ব্যাট তুলে এনেছিল আরেকটি ঝকমকে শতরান। টেস্ট ক্রিকেটে এমন সাড়ম্বর আবির্ভাব আর ঘটেনি।

অভিষেক-টেস্টে সেঞ্চুরির গৌরব তালিকায় নিউজিল্যাণ্ড ও পাকিস্তানের তিনজন করে ব্যাটসম্যান আছেন। সবশেষে জানিয়ে রাখি, আজহার ছাড়া মাত্র দুজন ব্যাটসম্যানই ইডেনে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরি করেছেন। এঁরা হলেন নিউজিল্যাণ্ডের অলরাউণ্ডার ব্রুস টেলর এবং ভারতের দীপক শোধন (বনাম পাকিস্তান)।

লয়েড ক্রিকেট ছাড়লেন

সম্রাট রায়

সতেরো বছরের ক্রিকেট-জীবনে ইতি টানলেন ক্লাইভ লয়েড। উনিশশো সাতষট্টির একটি সকালে বোম্বাইয়ে ব্যাট হাতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নেমেছিলেন লয়েড। চশমা-পরা, ছিপছিপে ব্যাটসম্যানটি ইনিংসের শুরুতেই ক্যাচ দিলেন স্লিপে অজিত ওয়াড়েকরের হাতে। 'স্নিক'টি মুঠোয় ধরে রাখতে পারলেন না ওয়াড়েকর। বল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ধুলো থেকেই উঠে দাঁড়ালেন লয়েড, শুধু সেই ম্যাচের জন্যেই নয়, পরবর্তী দুই দশক ক্রিকেট-বিশ্বে দাপটে রাজত্ব করার জন্যেও।

১৯৭৪ সালে লয়েডকে আমরা ফিরে পেয়েছিলাম ভারতের মাটিতে। সেইবারই বাঙ্গালোরে অধিনায়কের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে লয়েডের প্রথম আবির্ভাব। ক্রিকেটার লয়েড অবশ্য ততদিনে ব্যাট বল ফিল্ডিংয়ের সব বিভাগেই নিজস্ব উপস্থিতির কথা টের পাইয়ে দিতে শুরু করেছেন। ক্লাইভকে ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় দেখার অপেক্ষায় ছিল ভারত। অধিনায়কত্বে অভিষিক্ত হয়েই লয়েড বাঙ্গালোরে সেঞ্চুরি করলেন। এবং সিরিজের শেষ টেস্টে হাঁকালেন টেস্ট জীবনের সর্বোচ্চ স্কোর (২৪২)। নতুন অধিনায়কের পক্ষে এক

লয়েড (বাউণ্ডারি হাঁকাবার পূর্বমুহূর্তে)

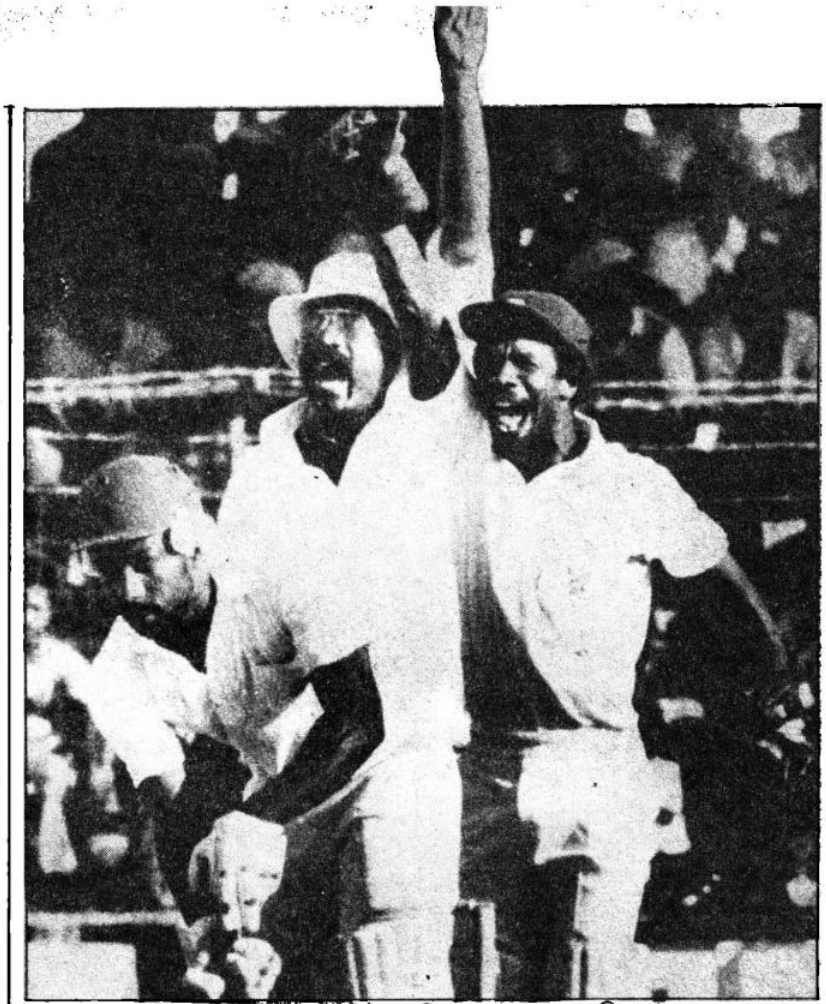

লয়েড (এল· বি· ডব্লু'র আবেদন জানাচ্ছেন বিপক্ষ-ব্যাট্‌সম্যানের বিরুদ্ধে)

স্বপ্নময় সূচনা। উনিশশো চুয়াত্তর থেকে বিভিন্ন সময়ে ভারত 'ক্যাপ্টেন-সমস্যায়' ভুগেছে। বেঙ্কট, বেদি, গাওস্কর, কপিলকে নিয়ে। ইংল্যাণ্ড বিব্রত থেকেছে ব্রিয়ারলি, বথাম, উইলিস, গাওয়ারকে নিয়ে। চ্যাপেল ভাইয়েরা, হিউজ ও বর্ডারকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াও অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছে বহুবার। কিন্তু লয়েড থাকায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে কখনও 'ক্যাপ্টেনসি প্রবলেমে' ভুগতে হয়নি। গত দশ বছর ধরে দায়িত্ব এবং দক্ষতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেটারদের উদ্বুদ্ধ করে গেছেন লয়েড। বয়স যত বেড়েছে, তত বেড়েছে তাঁর ব্যাটিং অ্যাভারেজ।

'৭৫ এবং '৭৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রুডেনশিয়াল কাপ জয়ের ঘটনায় লয়েডের অবদান অনেকখানি। কিন্তু লয়েডের নেতৃত্বেই তিরাশি সালে বিশ্বকাপের ফাইনালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ছিটকে যায় কপিলদেবের ভারতের কাছে। ঘটনাটি লয়েডকে এতখানি দুঃখ দিয়েছিল যে, তিনি প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নেতৃত্ব থেকে ছুটি চেয়েছিলেন। কিন্তু লয়েড নামক ক্রিকেটারটির প্রতি আস্থা হারাতে চাননি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। ১৯৮৪ সালে লয়েডকেই দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হল ভারত সফরে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উন্মাদ আক্রমণে বিশ্বকাপজয়ী ভারত সব কটি ওয়ান-ডে ম্যাচে তো হারলই, টেস্ট সিরিজও খোয়াল ০-৩ মার্জিনে। বিশ্বকাপে পরাজয়ের বদলা নিলেন লয়েড।

লয়েড ৭৪টি টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়কত্ব করেছেন। সংখ্যার বিচারে এটি বিশ্বরেকর্ড। সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছেন ফাইভ-নিলে। এবং একটানা দশটি টেস্ট জয়ের বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন সদ্যসমাপ্ত অস্ট্রেলিয়া সিরিজে।

ভারতের মাটিতেই যাঁর টেস্ট জীবনের সূচনা এবং অধিনায়ক হিসাবে আবির্ভাব, সেই ক্লাইভ লয়েডের সাতহাজারি ব্যাটটিকে আর দেখা যাবে না, এটা ভাবতেই কেমন যেন মনটা খারাপ লাগছে।

প্রিয় লেখক, প্রিয় বই

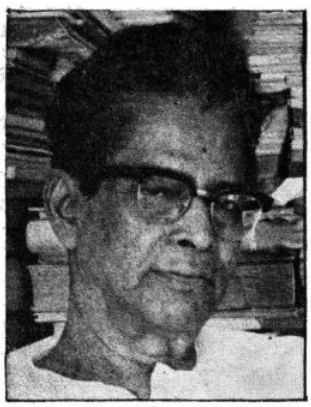

শুধু ঘনাদার গল্প লিখেই প্রেমেন্দ্র মিত্র অমর হয়ে থাকতে পারতেন। বল্‌গাহীন কৌতুককল্পনার রাজা এই ঘনাদার বিচিত্র কীর্তিকাহিনী, অনিঃশেষ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মজাদার মেসবাড়ি ও তার স্মরণীয় বাসিন্দারা, সন্দেহ নেই, ছোটদের মহলে যেমন বড়দের মহলেও তেমনি, চিরকালের জন্য জায়গা করে নিয়েছে। এহেন ঘনাদার দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার গল্প নিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে যে-তিনটি বই বেরিয়েছে, প্রত্যেকটিই দারুণ জনপ্রিয়। আবার এই ঘনাদাকে কোথা থেকে পেলেন তিনি, ঘনাদার ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের কেন্দ্র করে রচিত ইতিহাসভিত্তিক কাহিনী সংকলনে—'ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস'-এ— যখন শোনান প্রেমেন্দ্র মিত্র, তখন মনে না হয়ে যায় না যে, বিজ্ঞানের মত ইতিহাসের রহস্য-রোমাঞ্চও কোনো অংশে কম নয়। এ-বই ছাড়াও আরেকটা যে-ছোটদের বই তার নাম হল 'ছড়া যায় ছড়িয়ে'। উচ্ছল কৌতুকে, হালকা গড়নে, শব্দের যথার্থ প্রয়োগে, বুদ্ধিদীপ্ত পরিমিতিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়ায় যে-সম্পূর্ণ আলাদা স্বাদ, তারই নমুনা এই ছড়ার বইতে। সঙ্গে সুধীর মৈত্রের চোখ-জুড়োনো ছবি।

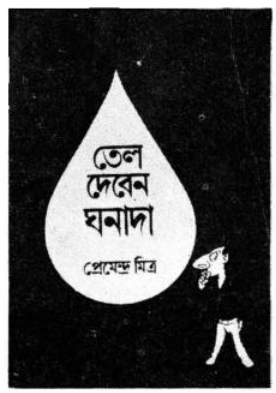

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটদের গ্রন্থসম্ভার :

যাঁর নাম ঘনাদা ৮·০০
ঘনাদার ফুঁ ৮·০০
তেল দেবেন ঘনাদা ৬·০০
ছড়া যায় ছড়িয়ে ৫·০০
ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস ৩৫·০০

আরো অনেক লেখকের অনেক মন-মাতানো বইয়ের জন্য চলে এসো আনন্দ পাবলিশার্স-এর সেই বইয়ের দোকানে ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ ঠিকানায় যে-দোকান কিনা শুধু ছোটদের জন্য

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

টেস্ট খেলার পত্তন

সুব্রত সিংহ

১৮৭৭ সালের ১০ মার্চ তারিখটি ক্রিকেট-ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। ওই বছর ওই দিনে প্রথম টেস্ট খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দেশ ছিল অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যাণ্ড। খেলা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে।

তবে ১৮৭৭ সালে এই প্রথম টেস্ট খেলাটি অনুষ্ঠিত হলেও 'টেস্ট' কথাটি কিন্তু প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল ১৮৯৪-৯৫ সালে। ওই দশকেরই শেষদিকে ইংল্যাণ্ডে গঠিত হয়েছিল ক্রিকেটের 'বোর্ড অব কন্ট্রোল'। তোমরা হয়তো আশ্চর্য হয়ে ভাবছ এটা কী করে সম্ভব। কিন্তু হ্যাঁ, ঘটনাটি সত্য।

ঘটনাটি এইরকম। ১৮৯৪-৯৫ সালের আগে যখন অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যাণ্ড একে অপরের দেশে যেত, তখন তাদের মধ্যে যে খেলাগুলি হত সেগুলিকে আন্তর্জাতিক ম্যাচ হিসাবে গণ্য করা হত। এমনকী, ১৮৭৭ সালের যে খেলাটিকে ক্রিকেট-পণ্ডিতরা 'প্রথম টেস্ট' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, সেই খেলাটিও ওইরকমই একটি খেলা কার্যত, ওই খেলাটি হয়েছিল মেলবোর্ন ও সিডনির সম্মিলিত একাদশের সঙ্গে জেমস লিলি হোয়াইটের নেতৃত্বাধীন সফরের একটি পেশাদারি দলের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই খেলাটিই ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম টেস্ট হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

যাই হোক, এবার এই প্রথম টেস্টে কী কী ঘটনা ঘটেছিল, তাই নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। তখনকার দিনে আজকের মতো ছ'ঘণ্টা বা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা খেলার প্রথা চালু ছিল না। তখন খেলা শুরু হত দুপুর একটা থেকে, আর শেষ হত বিকেল পাঁচটায়। তার মধ্যে ৪০ মিনিট নির্ধারিত ছিল মধ্যাহ্ন বিরতির জন্য। আর, ওভার ছিল, ছয় নয়, চার বলের।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ডেভিড গ্রেগরি টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম বলটি খেলার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন পঁচিশ বছর বয়স্ক চার্লস ব্যানারম্যান। ওই ব্যানারম্যানই টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম রান (দ্বিতীয় বলে) ও প্রথম শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম বলটি করার সৌভাগ্য হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের অ্যালফ্রেড শ'র।

চার্লস ব্যানারম্যান (টেস্ট-ক্রিকেটে প্রথম রান)

ব্যানারম্যান তাঁর শতরানটি করেছিলেন ১৬০ মিনিটে। প্রথম দিনে তিনি ১২৬ রানে অপরাজিত থেকে যান। পরের দিন ১৬৫ রানের মাথায় উলিয়েটের একটি লাফানো বলে আঙুলে আঘাত পেয়ে অবসর নিয়েছিলেন।

ওই টেস্টে ৪৫ রানে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট-ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। আর, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, ঠিক একশো বছর বাদে ওই মেলবোর্নেই শতবার্ষিকী টেস্টেও অস্ট্রেলিয়া ওই একই ফলাফলে (৪৫ রানে) ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে একটি বিস্ময়কর নজির সৃষ্টি করেছিল।

১৮৬১ সালে স্টিফেনসনের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডের যে ক্রিকেট-দল প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় যায়

ধাঁধা

সারা দুপুর ধরে আমরা যে-খেলাটা খেলেছিলাম, তাকে বলে শব্দ তৈরির খেলা। ইংরেজিতে, 'ওয়ার্ড মেকিং'। প্রথমে ঠিক হল, একটা বড় শব্দ বলবে ছোট্‌কা। সেটার থেকে অক্ষর নিয়ে তৈরি হবে নানান ছোট-ছোট শব্দ। যে যত বেশি শব্দ তৈরি করতে পারবে, সে জিতবে। তবে হিজিবিজি অক্ষরসমষ্টি হলে হবে না, পরিষ্কার শব্দ হতে হবে। অর্থাৎ, মানে থাকবে শব্দটার।

অবশ্য এত কথা বলার দরকার ছিল বলে মনে হয় না। তোমরা নিশ্চিত অনেকেই 'ওয়ার্ড মেকিং' খেলাটা নিজেরা খেল, আর তাই এই খেলার নিয়মকানুন ও মজা-টজাও তোমাদের জানা।

আমি বরং বলি, এই অক্ষর বসিয়ে শব্দ তৈরির খেলা খেলতে-খেলতে ছোট্‌কা যেসব মজার-মজার ধাঁধা দিয়েছিল আমাদের, সেগুলোর কথা।

যেমন ধরো, অদ্ভুত ধরনের কিছু অক্ষর তোমাদের সামনে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো একটা শব্দের মধ্য থেকে তুলে নেওয়া। এর আগে ও পরে ইংরেজি অক্ষর বসিয়ে চেনা শব্দ তৈরি করতে হবে।

একটা বরং দেখিয়ে দিই। ধরো, দেওয়া হল—YGM। আগে-পরে শব্দ বসিয়ে তৈরি করা যায়—PYGMY।

এই ধরনেরই কয়েকটি শব্দ নিয়ে এবারের শুরু।

প্রথম ধাঁধা ॥ আগে-পরে অক্ষর বসিয়ে অর্থপূর্ণ চেনা শব্দ তৈরি করো—

(ক) tomo (খ) xyg (গ) xop

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ সাত-অক্ষরের ইংরেজি শব্দে লুকিয়ে আছে আটটি শব্দ, যে-আটটি শব্দ বার করতে গিয়ে মূল অক্ষরগুলোকে আগে-পরে করে নিতেও হবে না?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

পকেশতলি

গতবারের উত্তর ॥ (১) বুবুনের ১০, বাবার ৪০। (২) ১০। (৩) চিরাচরিত।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

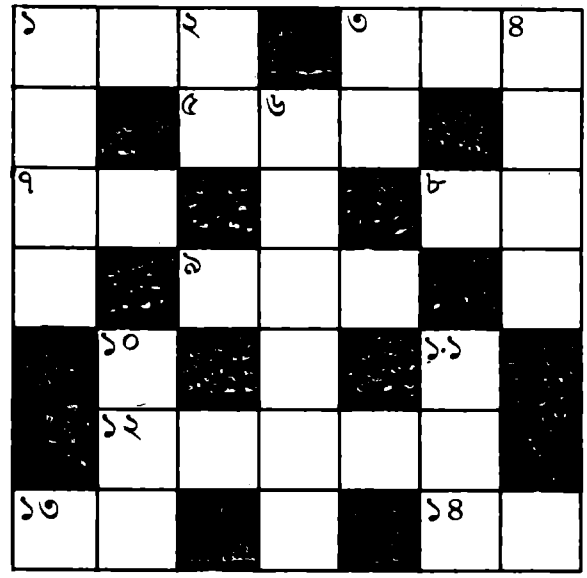

সংকেত : পাশাপাশি : (১) বাংলা বছরের শেষ উৎসব। (৩) বুদ্ধিমান। (৫) বিদ্যুৎ, অর্থান্তরও আছে। (৭) পবিত্র তীর্থস্থান। (৮) প্রদীপ। (৯) দেখে মনে হয় কী মধুর ফল, ভিতরে কিন্তু প্রকৃতির ছল! (১২) দরকারি জিনিস। (১৩) ইন্দ্রলুপ্ত মানে কী? (১৪) গালা।

উপর-নীচ : (১) আগুনে-পাথর। (২) নবজাত। (৩) যে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে। (৪) নানারকম। (৬) সৈনিকরা প্রদর্শন করে। (১০) নাকের অলংকার। (১১) রোগবিশেষ।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

আ	জা	র	বা	ই	জা	ন
জা	■	প্তা	■	স্পা	■	বী
দ	■	নি	পা	ত	■	ন
হি	ম	■	হা	■	কুঁ	চ
ন্দ	■	ও	ড়	না	■	ন্দ্র
ফৌ	■	ষ	■	টি	■	সে
জ	ল	ধি	■	কা	ঞ্চ	ন

মজার খেলা

নটা টুথপিক কিংবা দেশলাইকাঠি, সেই কাঠি দিয়ে টেবিলের উপর সাজানো একটা উদ্ভট অঙ্ক ও একজন বন্ধু (কম করে)— এই মোট চাই এবারের মজার খেলার জন্য। আর, এর বাইরে যা চাই, তা হল—বেশ কিছুটা বুদ্ধি যা দিয়ে নাকি সমাধান করা যাবে উদ্ভট অঙ্ক থেকে উদ্ভূত সমস্যার।

প্রথমে বলি সমস্যাটার কথা। নটি কাঠি দিয়ে টেবিলের উপর সাজাতে হবে নীচে দেখানো ভুল অঙ্কটা, সেখানে দেখানো হচ্ছে ১ থেকে ৩ বিয়োগ দিলে উত্তর হচ্ছে ২—

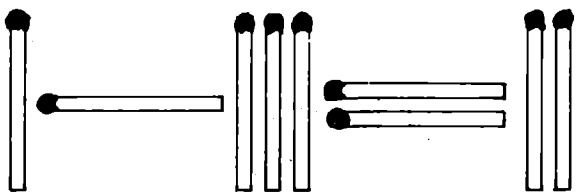

বন্ধুকে এটা দেখিয়ে বলতে হবে, একটা কাঠি এদিক-ওদিক করে বসিয়ে একটা শুদ্ধ অঙ্কের চেহারা সাজাতে হবে টেবিলে।

কিন্তু বললেই তো বন্ধু পারবে না। এটা করতে হলে বুদ্ধি চাই বেশ কিছুটা। সুতরাং বন্ধু কতটা পারবে বা আদৌ পারবে কিনা, তা বলা কঠিন। তবে কিনা, যে এই মজার খেলাটা করতে দিচ্ছে, তাকে এর সমাধান শেষ পর্যন্ত জানতেই হবে। সে তার বুদ্ধিতে কুলোক বা না কুলোক। তাই উত্তরটাও দেওয়া রইল। বন্ধুর কাছে মানটা অন্তত বাঁচবে এতে—

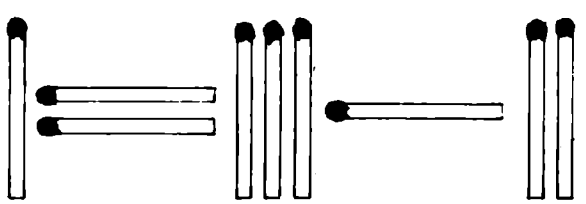

অর্থাৎ, ১=৩-২। রোমান হরফের এই অঙ্ক নির্ভুল। তাই না?

মজারু

হাসিখুশি

"আমাকে কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের জীবনী দেখাতে পারেন?"

"নিশ্চয়ই। কার কার জীবনী চাই?"

"যাঁরা ছেলেবেলায় অঙ্কে শূন্য পেতেন।"

"খুব খিদে পেয়েছে। সকাল থেকে কোনো খাবারই খাইনি।"

"এতে চিন্তিত হবার কিছু নেই। সকালে খাবারের স্বাদ যেরকম ছিল, এখনও তাই আছে।"

বিচারক : আপনার পক্ষের কোনো উকিল আছেন কি?

আসামি : না, নেই। কিন্তু জুরিদের মধ্যে কেউ-কেউ আমার খুব বন্ধু।

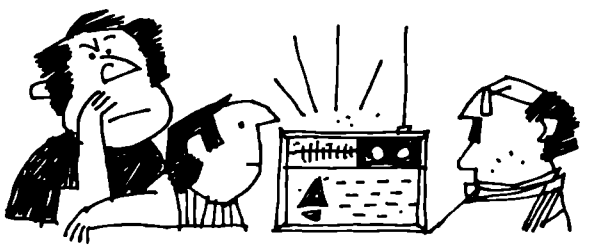

"তিনি যখন কথা বলেন, দেশবাসী মন দিয়ে শোনে।"

"খুব বিখ্যাত লোক বুঝি তিনি?"

"না, রেডিওতে খবর পড়েন।"

"তোমাকে যদি একটা অভিধান লিখে দিতে বলা হয়, তুমি কী করবে পিকলু?"

"প্রথমেই শক্ত-শক্ত শব্দগুলো বই থেকে বাদ দিয়ে দেব।"

"গান গাওয়ার জন্য এই প্রথম পুরস্কার পেলাম আপনার কাছ থেকেই।"

"ওটা গান গাওয়ার জন্য নয়। আর কখনও গান গাওয়ার চেষ্টা করলেই পুরস্কার ফিরিয়ে নিয়ে যাব।"

"বাবা, তুমিই না সেদিন বলেছিলে, 'শূন্য'র জন্ম ভারতবর্ষেই?"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম। তাতে কী হয়েছে?"

"তাহলে আমি অঙ্কে শূন্য পেলে রেগে যাও কেন?"

ছবি : দেবাশিস দেব

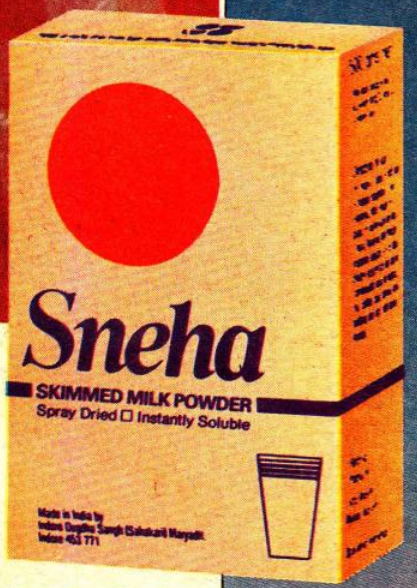

স্নেহ
নিমেষে গুলে যায় এমন স্কীমড় মিল্ক পাউডার
স্নেহ স্কীমড় মিল্ক পাউডার। শুধু জলে দিলেই হ'ল...নিমেষে গুলে যায়! গরম জল দরকার নেই। দলা পাকায় না। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। পুষ্টিতে ভরা কম চর্বিযুক্ত এই দুধ সরাসরি ব্যবহার করুন— চা বা কফি, দই বা মিষ্টান্ন বানানোর জন্যে।
স্নেহ স্কীমড় মিল্ক পাউডার। পুষ্টিগুণে ভরা এই সুবিধাজনক প্যাক হাতের কাছে রাখুন।
মধ্য প্রদেশ দুগ্ধ মহাসংঘের উৎকৃষ্ট ডেয়ারী উৎপাদন
Sneha
SKIMMED MILK POWDER
Spray Dried □ Instantly Soluble
স্নেহ-প্রকৃতির সস্নেহ উপহার!
OBM/4477-BEN

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

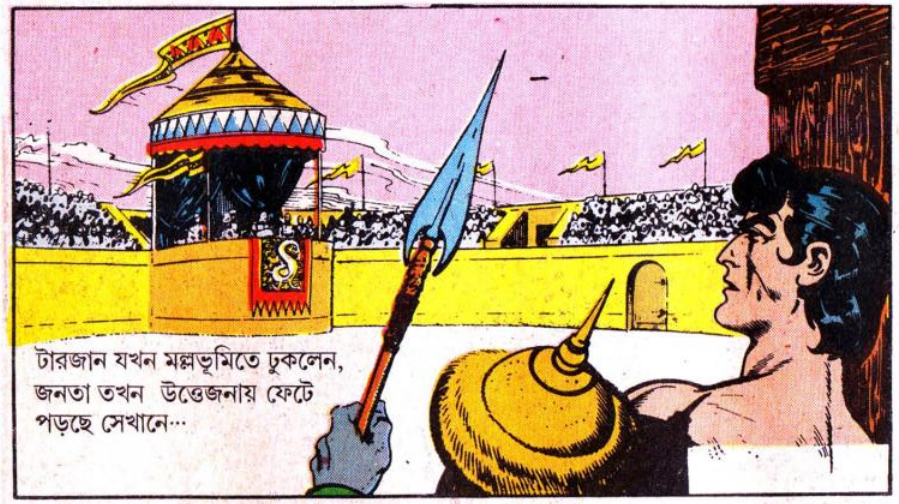

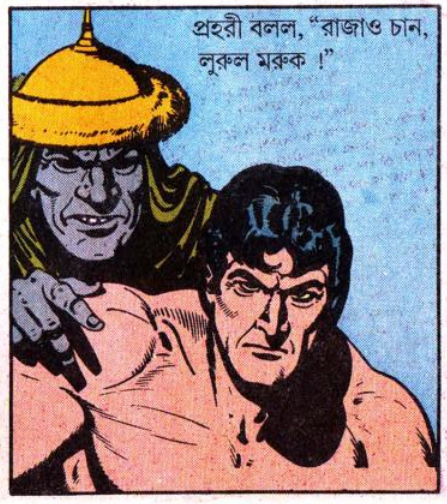

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বারাকপুর গার্লস' হাইস্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা কী বলেন

বারাকপুর স্টেশন থেকে কয়েক পা এগোলেই বারাকপুর গার্লস' হাইস্কুল। ২৪ পরগনা জেলার পুরনো এবং প্রসিদ্ধ এই মহকুমা শহরে মেয়েদের যে-কটি স্কুল আছে, তার মধ্যে বারাকপুর গার্লস' হাইস্কুলের বয়সই সবচেয়ে বেশি। শুধু বয়সেই নয়, নামডাকের দিক থেকেও এই স্কুলটি বেশ এগিয়ে আছে।

স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উদ্যোগে স্বাধীনতার ঠিক দু'বছর আগে, ১৯৪৫ সালে, এই স্কুলটি গড়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালের ১২ অগস্ট সরকারি অনুমোদন পায়। বস্তুত, ওই সময় থেকেই স্কুলটি পুরোদমে চালু হয়।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রধানা শিক্ষিকা ছিলেন জয়ন্তী সেন। প্রাক্তন ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। প্রিয়ংবদা ঘোষ, স্মৃতিকণা গুপ্ত, ডঃ জয়শ্রী আইচ, ডঃ অরুণিমা পোদ্দার, সুমিত্রা হাজরা, গৌরী কর্মকার, ভারতী গুপ্ত, মিত্রা ঘোষ—এঁদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বারাকপুর গার্লস' হাইস্কুলের বর্তমান ছাত্রী-সংখ্যা প্রায় ১১০০। প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় প্রায় ১০০ জন। পাশ করে ৯০/৯৫ জন। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৯৫ জন ছাত্রী। প্রথম বিভাগে পাশ করেছে ২৪ জন। দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে ৫৯ জন। বাদবাকি তৃতীয় বিভাগ। একজনও ফেল করেনি। স্টার পেয়েছে ৩ জন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ১০৪ জন। ১১ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। কেউ ফেল করেনি।

এই স্কুলের বর্তমান প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী রীতা সেন উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের এম এসসি। তাঁর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা তেরো বছরের। এর আগে তিনি হুগলির একটি নামী স্কুলে সহকারী শিক্ষিকা ছিলেন। বারাকপুর গার্লস' হাইস্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা হিসেবে এসেছেন মাত্র এক বছর আগে, ১৯৮৪ সালের ৩ জানুয়ারি।

কীভাবে তৈরি হলে পরীক্ষায় ভাল করা যাবে, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী সেন জানালেন, "সারা বছর ফাঁকি দিয়ে, কেবল পরীক্ষা-বৈতরণী পেরোবার জন্য যারা মাত্র কয়েকটা দিন দারুণ পড়ুয়া হয়ে যায়, তাদের সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। কিন্তু যারা লেখাপড়াকে ঠাট্টার বিষয় মনে করে না, গোটা বছর মন দিয়ে পড়াশোনা করে, যারা পরিশ্রমী, একাগ্রচিত্ত, যাদের অধ্যবসায় আছে, চোখ-কান খোলা রেখে যারা পাঠগ্রহণ করে, তাদের ঠেকায় কার সাধ্য! পরীক্ষায় ভাল ফল তো তাদের জন্য বাঁধা। আসলে পড়াশোনাটা যেন সত্যি-সত্যি পড়াশোনা হয়। ক্লাস-ফাঁকির প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। ক্লাসে হয়তো একটু জটিল বিষয় পড়ানো হচ্ছে, মাথায় ঠিক-ঠিক ঢুকছে না, অমনি 'একটু বাইরে যাব' বলে সুড়ুত করে ক্লাস থেকে সরে পড়লাম—এটা মোটেই ভাল নয়। এর ফল দাঁড়াল এই, বিষয়টা যেমন জটিল ছিল, তেমনই রয়ে গেল। পরীক্ষার খাতায় সাপ লিখতে গিয়ে ব্যাঙ লিখে এল। মোট কথা, ক্লাসে নিয়মিত আসতে হবে, কোনো অবস্থাতেই ক্লাস ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

"আর-একটা ক্ষতিকর জিনিস হল নোটবই। অসার জিনিসে ঠাসা এই নোটবইগুলি, আমার অভিমত, একদম বর্জন করা উচিত। পাঠ্যবই যদি বেশ ভাল করে পড়া থাকে, তাহলে কোনও ঝঞ্ঝাটই নেই। পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়া, নিয়মিত হোমটাস্ক করা, শুদ্ধ এবং যথাযথ উত্তর লেখা, লেখার গতি বাড়ানো, পরীক্ষায় ভাল ফল করতে হলে এগুলো সবই দরকার।"

কীভাবে ইংরেজি ও বাংলা পড়া উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী সেন

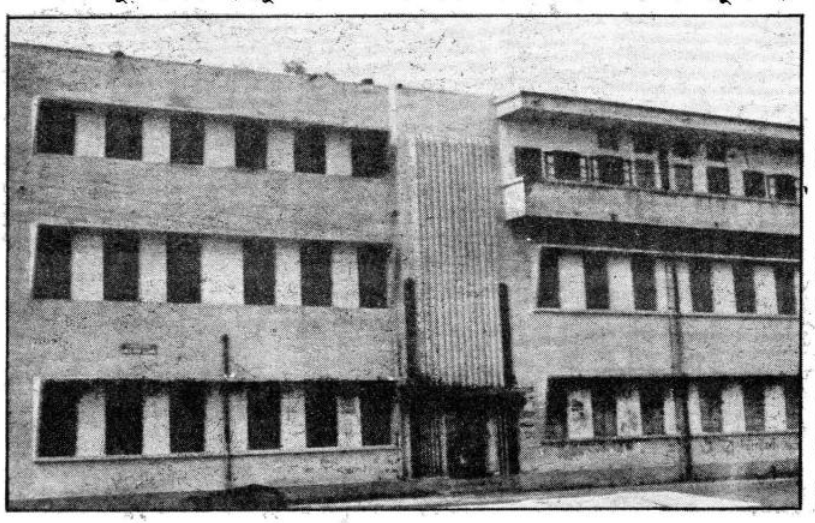

বললেন, "টেক্সট্‌বই আগাগোড়া পড়তে হবে। গ্রামার-ট্রানস্লেশন একটু খটোমটো বটে, কিন্তু নিয়ম করে পড়তে হবে, লিখতে হবে। গ্রামার ভালভাবে জানা থাকলে ইংরেজি আদৌ জটিল বিষয় মনে হবে না। স্বাধীনভাবে লেখারও ক্ষমতা আসবে। নানা ধরনের পত্র-পত্রিকা এবং ইংরেজি বই পড়ার অভ্যাস করতে পারলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

"'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না' প্রবাদটি বাংলার ব্যাপারে খুব সত্যি। বাংলা মাতৃভাষা বলে তেমন কদর পায় না, অনেকেই খুব হেলাফেলা করে। এর ফলে হয় কী, বিস্তর ছেলেমেয়ে বাংলায় যাচ্ছেতাই নম্বর পায়, ফেল করে। বাংলা যতটা সোজা সরল মনে হয়, ততটা নয়। ভাল বাংলা লেখা, বাংলায় ভাল নম্বর তোলা, সুন্দর করে বাংলা বলতে পারা—খুব সহজ কাজ নয়। ইংরেজির মতো বাংলার ব্যাকরণ-অংশটি যত্নের সঙ্গে পড়া থাকলে ভাবনার কিছু নেই। নম্বর উঠবে চমৎকার। বাংলা পড়াও সার্থক হবে। ভাষায় সাধু-চলিতের মিশেল যাতে না হয়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে।"

অঙ্ক সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, "স্নান-আহার ইত্যাদি নিত্যকর্মের মতো অঙ্কও নিয়ম করে কষতে হবে। তাহলে অঙ্কের ভয় অনেকটা কেটে যাবে। জ্যামিতি অনেকে মুখস্থ করে, এটা মোটেই ভাল নয়। জ্যামিতি বুঝতে হবে মাথা সাফ করে। কাকে একান্তর কোণ বলে আর কাকেই বা বলে বিপ্রতীপ কোণ, এ তো মুখস্থ করার ব্যাপার নয়, মাথা পরিষ্কার রেখে বোঝার ব্যাপার।"

বিজ্ঞান সম্পর্কে শ্রীমতী সেন জানালেন, "বিজ্ঞানও অনেকটা অঙ্কের মতো। মুখস্থ করে কোনও লাভ হয় না। ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধি খরচ করে বুঝতে হয়। আর-একটা কথা, বিজ্ঞান যদি নানা ধরনের উপকরণের মাধ্যমে পড়ানো হয়, তাহলে অনেক গোলমেলে ব্যাপারও পরিষ্কার হয়ে যায়।"

ইতিহাস সম্পর্কে প্রধানা শিক্ষিকার বক্তব্য, "ইতিহাসকে অনেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, বিষয় হিসেবে তেমন গুরুত্ব দেয় না। এটা ঠিক নয়। ইতিহাস বাস্তবিকই জীবন্ত বিষয়। ভালভাবে পড়া থাকলে নম্বরও ওঠে খুব ভাল।" সামনেই ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষিকা শ্রীমতী সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন, "ইতিহাস এমন একটা বিষয়, যা মুখস্থ না করলেই নয়। মুখস্থ না করলে সাল, তারিখ, ঘটনাপঞ্জি—এসব মনে থাকবে না। তখন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপবে। ইতিহাসে ভাল ফল করতে হলে সহায়ক-বই পড়া উচিত।"

ভূগোল সম্পর্কে প্রধানা শিক্ষিকা নিজে কোনও মতামত দিলেন না। তিনি ডেকে পাঠালেন ভূগোলের শিক্ষিকা শ্রীমতী উমা দত্তকে। শ্রীমতী দত্ত বললেন, "ভূগোলে ম্যাপের গুরুত্ব অসীম। কাজেই ম্যাপ আঁকাটা ভালভাবে রপ্ত করতে হবে। আর, ভূগোলের 'জলবায়ু' অংশ খুব মন দিয়ে পড়া থাকলে, ঝামেলায় পড়তে হবে না। আমার মনে হয়, সাম্প্রতিক তথ্যের ভিত্তিতে ভূগোল পড়া উচিত। পৃথিবী এবং জীবন প্রতিনিয়ত পালটাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচয় হওয়া দরকার।"

কর্মশিক্ষা বিষয়টির গুরুত্ব কম নয়, এ-কথা স্বীকার করে শ্রীমতী সেন একটু ক্ষোভের সুরে বললেন, "বেশিরভাগ স্কুলেই কর্মশিক্ষা একটা তামাশার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীর নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই।"

'আনন্দমেলা' সম্পর্কে প্রধানা শিক্ষিকা বললেন, "দেখুন, আপনি 'আনন্দমেলা'র লোক, আপনার সামনে আপনাদের কাগজ সম্পর্কে কিছু বলি তো ভাববেন, বাড়িয়ে বলছি। শুধু একটা কথা বলি, বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনন্দমেলা কাড়াকাড়ি করে পড়ি। 'কাড়াকাড়ি' শব্দটি যে কত জোরদার, বাড়িতে 'আনন্দমেলা' এলে টের পাওয়া যায়।"

শ্যামলকান্তি দাশ

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

বারাকপুর গার্লস' হাইস্কুলে ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে রুনা বল। প্রথম থেকেই এই স্কুলে রুনা পড়ছে, ফার্স্ট হচ্ছে ক্লাস এইট থেকে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় মোট ৯০০ নম্বরের মধ্যে রুনা পেয়েছে ৬৭৬। রুনার বাবা শ্রীমানিক বল ও মা শ্রীমতী বীথিকা বল দু'জনেই অধ্যাপনা করেন।

রুনা দিনে ছ'সাত ঘণ্টা পড়ে। ছুটির দুপুরে সাধারণত অঙ্ক করে, কখনও-কখনও পড়ে গল্পের বই। রুনার কোনও গৃহশিক্ষক নেই। বাবা বাংলা ইংরেজি আর ইতিহাস দেখিয়ে দেন, মা দেখিয়ে দেন অঙ্ক, বিজ্ঞান।

বাংলায় বামনদেব চক্রবর্তী ও পি আচার্যর বই পড়ে। ইংরেজিতে পড়ে

পি. কে. দে সরকার, পি. মাহাতো, এ সি. সেন ও রেন-মার্টিনের বই। ইতিহাসে পড়ে কিরণ চৌধুরী ও প্রভাতাংশু মাইতির বই। ভূগোল: মণীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, অমরনাথ সেনগুপ্ত ও তরুণবিকাশ লাহিড়ি, ভূগোল-শিক্ষক সম্মিলনীর বই। অঙ্ক: কে সি নাগ, সেভেন টিচার্স। জীবনবিজ্ঞান: অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী, কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু, সান্যাল-চ্যাটার্জি। ভৌত বিজ্ঞান: সুখেন্দু মাইতি, প্রতীপ চৌধুরী ও নিতাই মুখোপাধ্যায়।

ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায় রুনা। অবসর-সময়ে গল্পের বই পড়ে। ছবি আঁকে। গান গায়। সত্যজিৎ রায়ের লেখা খুব প্রিয়। প্রিয় খেলা ব্যাডমিন্টন আর ক্রিকেট। রুনা নিজেও ক্রিকেট খেলে।

'আনন্দমেলা' রুনার প্রিয় পত্রিকা। 'লেখাপড়া' বিভাগ খুব কাজ দেয়। সবচেয়ে ভাল লাগে সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি। "কী সুন্দর আঁকা ওঁর। ইশ্, আমি কবে এ-রকম আঁকতে পারব!"

সারা অঙ্গে কোমলতার পরশ

এখন স্নানের পরে এক
কোমলতার নতুন অনুভূতির
জগতে প্রবেশ করুন।
নতুন পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম
সাবানের সমস্ত গুণই ছড়িয়ে
পড়বে আপনার সারা অঙ্গে...
আপনার ত্বককে করে তুলবে
মোলায়েম ও কোমল।

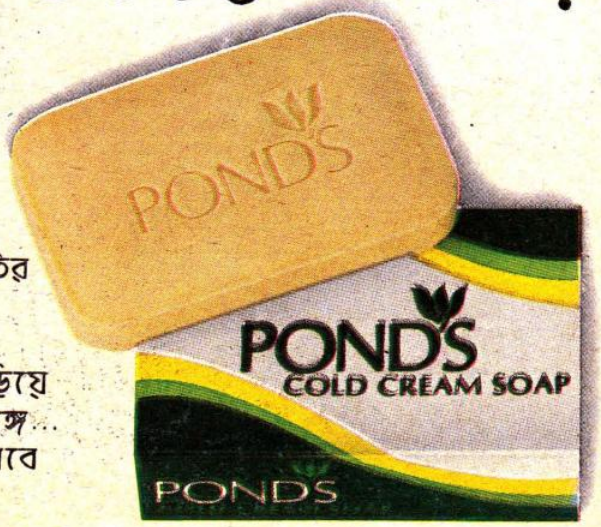

নতুন

পণ্ডস্

কোল্ড ক্রীম সাবান

পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীমের
সমস্ত গুণে ভরা

OBM/3920/BN

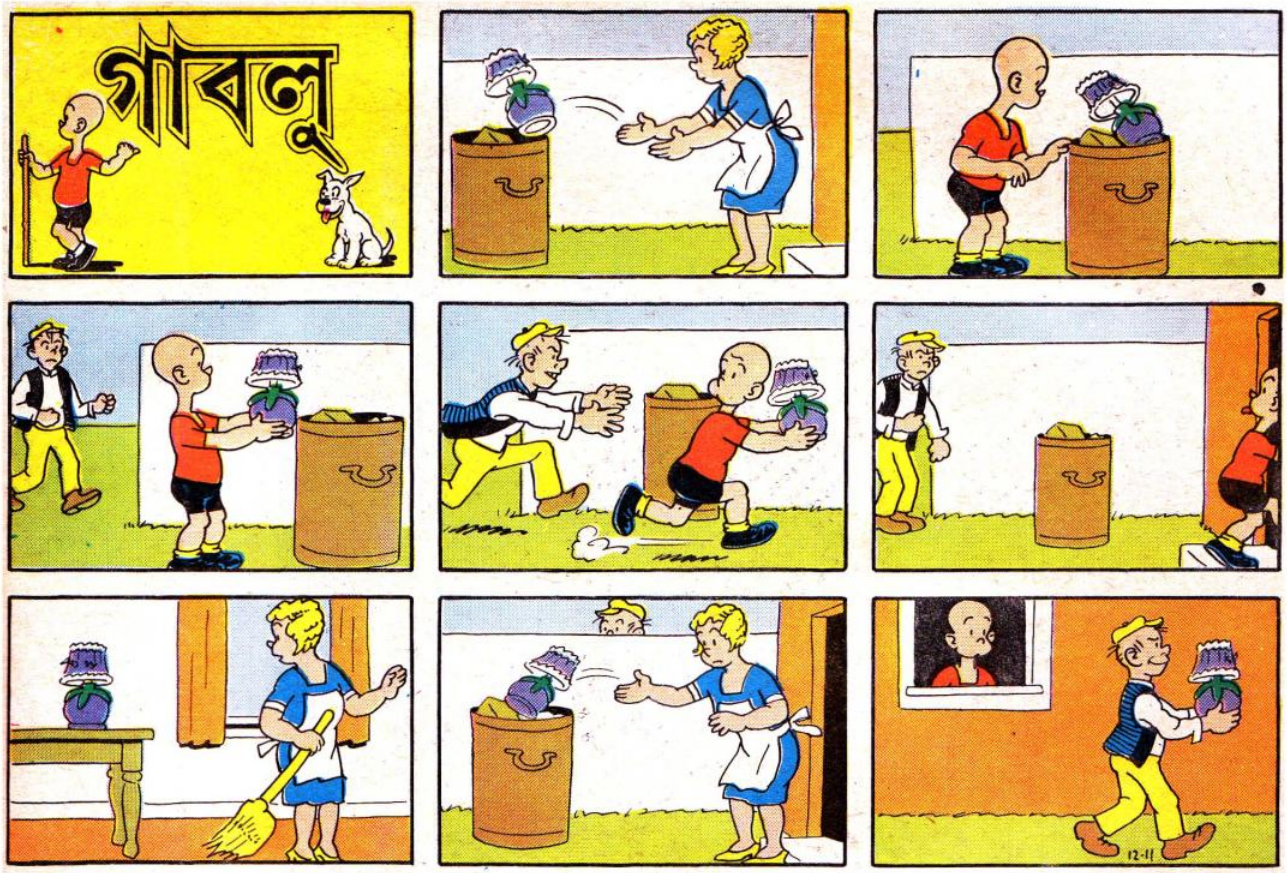
গাবলু

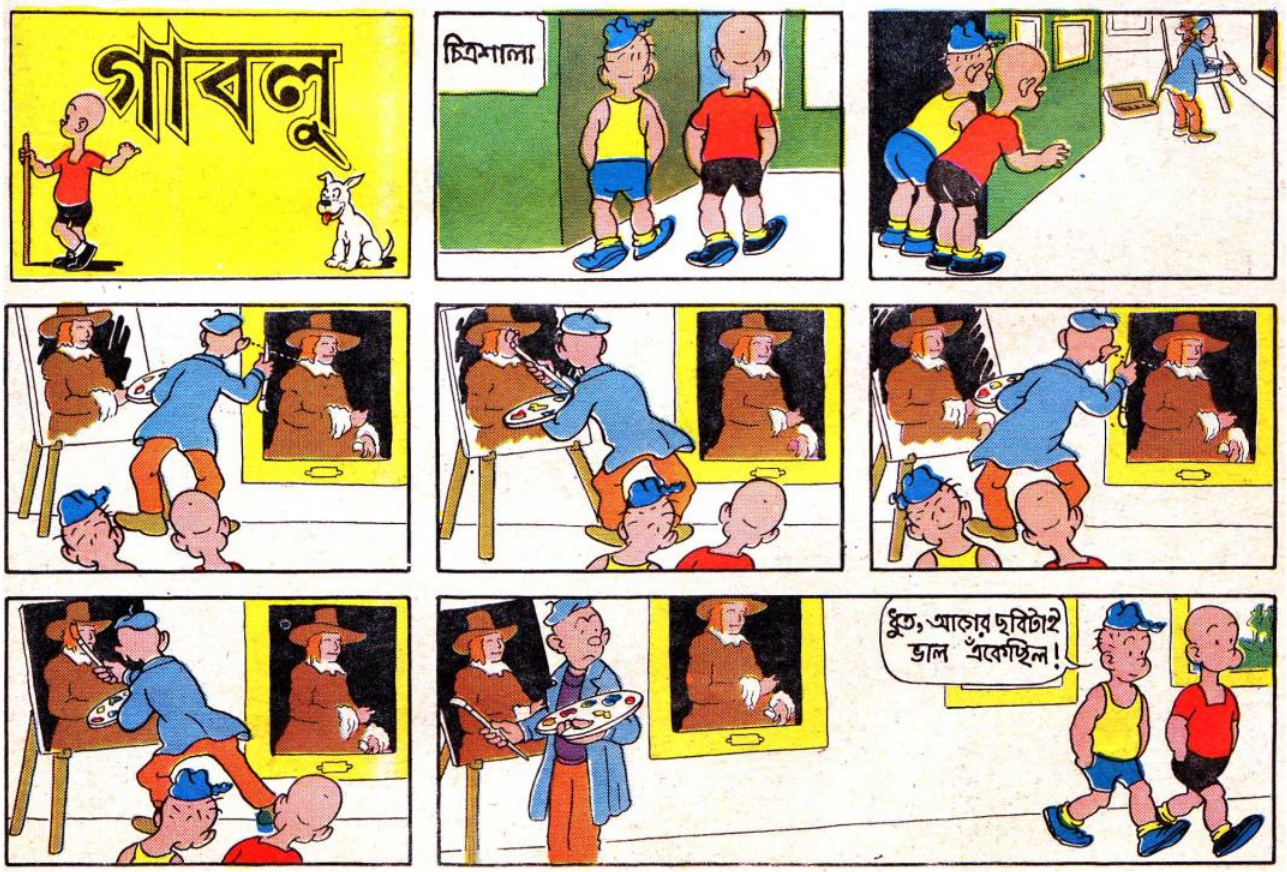
গাবলু
চিত্রশালা
ধুত, আগের ছবিটাই ভাল এঁকেছিল!

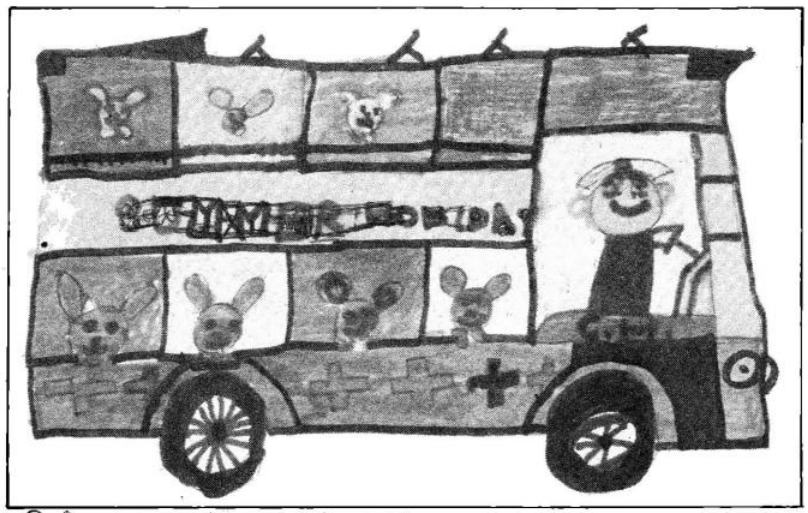

ছবি এঁকেছে **অংশুমান মণ্ডল** (বয়স ৬)

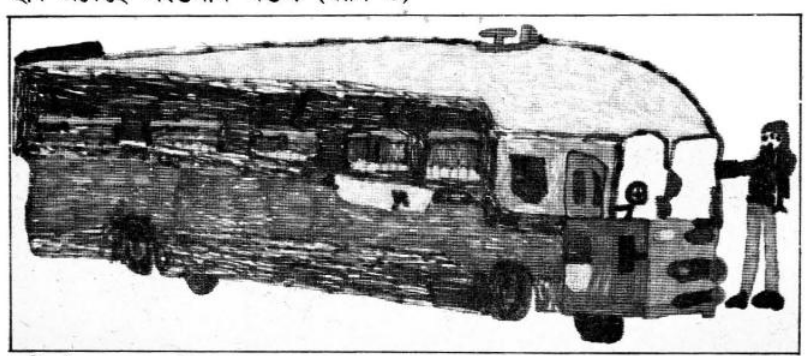

ছবি এঁকেছে **বাবাই দাশগুপ্ত** (বয়স ৬)

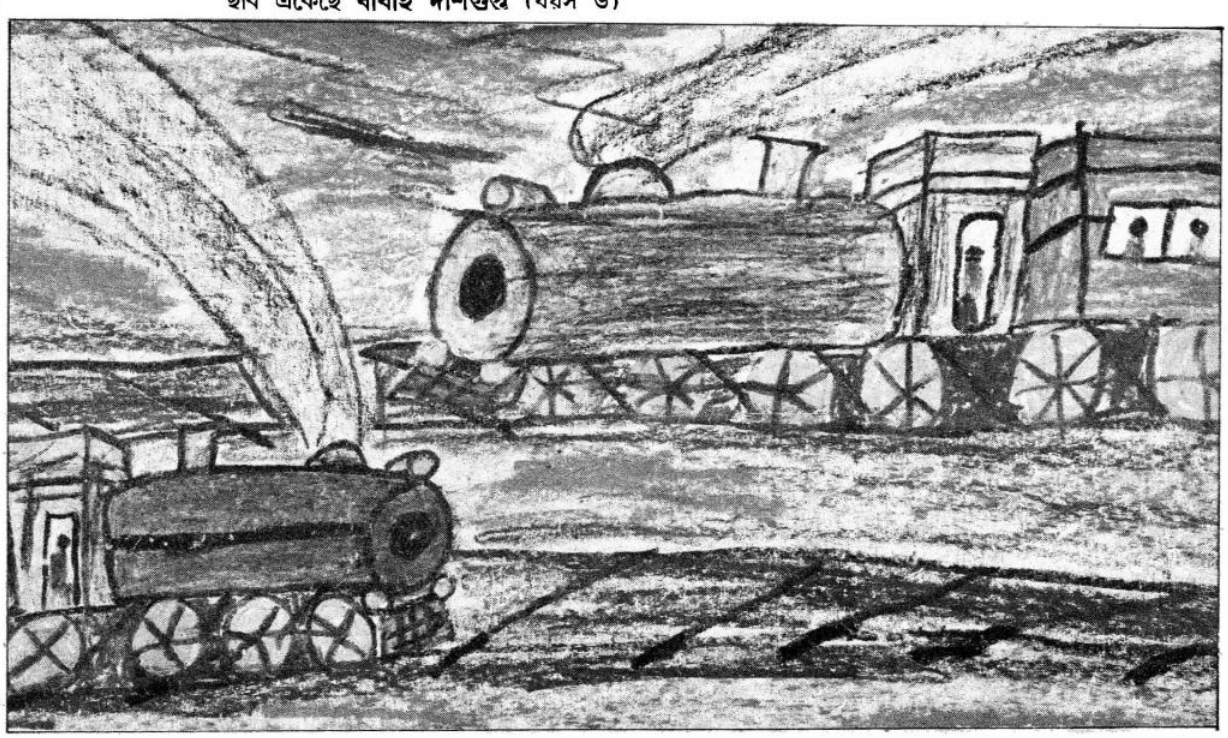

ছবি এঁকেছে **সঞ্জয় রায়** (বয়স ১১)

প্রেমপত্র আর অঙ্ক জটিল
দুয়ের মধ্যে আছে কি মিল ?

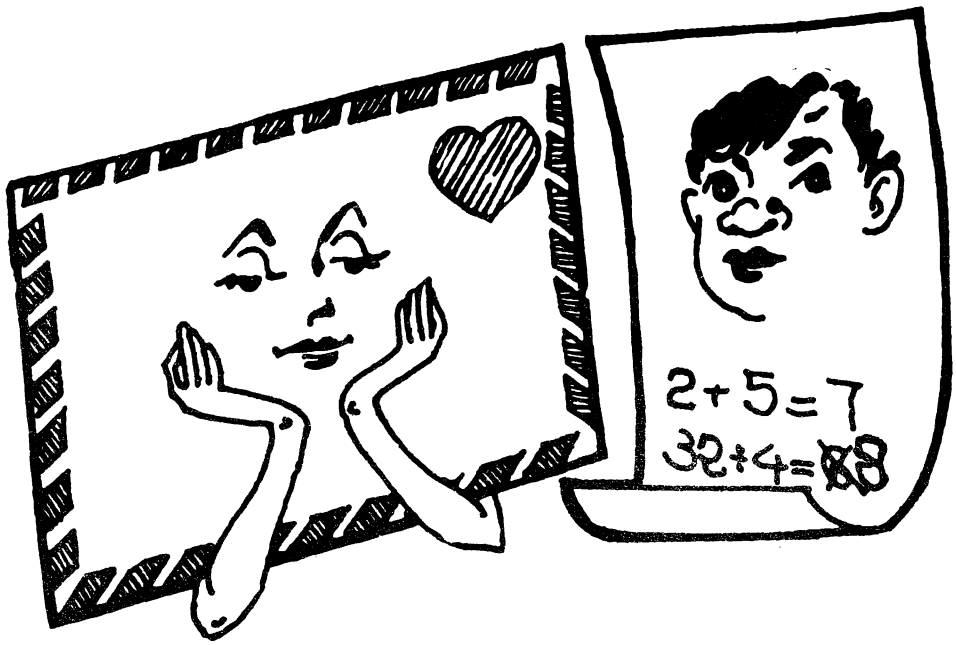

Chelpark

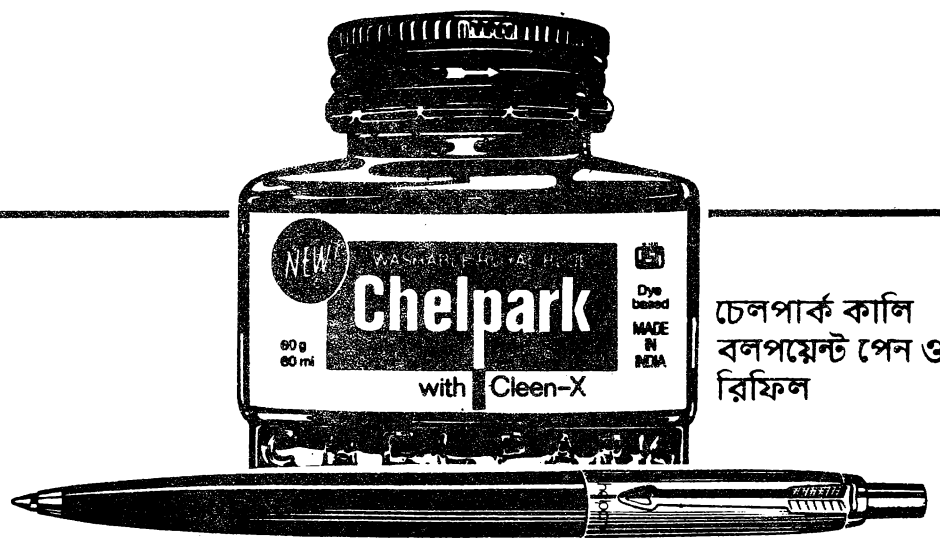

চেলপার্ক কালি
বলপয়েন্ট পেন ও
রিফিল

যে নাম লক্ষ লক্ষ মানুষের
আঙুলের ডগায়।

CCL-1597

ANANDAMELA 6 FEBRUARY 1985. Read. No. WB/CC/264. MH-Bv-SOUTH 683TN/MS(C) 731

ফিরে ফিরে দেখে লোকে...
সুপার রিন-এর চমকটিকে!

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক...

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS RIN 86 2619 BG